দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

চব্বিশ ঘণ্টায় মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের প্লাস্টার হয়ে গেল ক্রেপ ব্যান্ডেজ
— পৃঃ ২৩

৭৩ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা।। ২৯ মার্চ ২০২১।। ১৫ চৈত্র - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২ ।। website : www.eswastika.com

হুইলচেয়ারের নাটকে কি সহানুভূতি জুটবে ?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ১৫ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২৯ মার্চ - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

পা-পালা-পাতাল ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৬

মমতার জাতিভেদের কারণে বিজেপি বিকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে ▯ সজ্জন কুমার ▯ ৮

বিজেপির ইস্তাহার ও নারীশক্তির জাগরণ ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ১০

এবারের বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১১

প্রার্থী বাছাই নিয়ে দলীয় কোন্দলকে গুরুত্ব দিলে চলবে না ▯ বিশ্বপ্রিয় দাস ▯ ১৩

পাকা ফসল ঘরে তোলার সময় আবেগের জটিলতা কাঙ্ক্ষিত নয় ▯ সুকল্প চৌধুরী ▯ ১৫

রামমন্দির নিধি সংগ্রহে চুয়াল্লিশ দিনে একুশশো কোটি ▯ দুর্গাপদ ঘোষ ▯ ১৭

চব্বিশ ঘণ্টায় মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের প্লাস্টার হয়ে গেল ক্রেপ ব্যান্ডেজ ▯ সুজিত রায় ▯ ২৩

হুইল চেয়ারের নাটক করে কি সহানুভূতি জুটবে? ▯ হীরক কর ▯ ২৫

মুখ্যমন্ত্রীর আঘাত পাওয়া প্রমাণ করে বোতলবন্দি দৈত্য ছাড়া পেয়েছে ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ২৭

মাদারগাছি উচ্চবিদ্যালয় প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে ▯ ড. বৃন্দাবন ঘোষ ▯ ৩১

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূল নির্যাস গীতা ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩৩

ভোটের বাজারে তৃণমূলের হাতিয়ার শেখ মুজিব এবং দেশি-বিদেশি মৌলবাদীরা ▯ মৌ চৌধুরী ▯ ৩৫

মাননীয়া এখন খড়কুটো ধরে বাঁচতে চাইছেন ▯ জাহ্নবী রায় ▯ ৪৩

গত দশ বছরের বঞ্চনা যেন হুইলচেয়ারে চাপা না পড়ে ▯ ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী ▯ ৪৪

মাওবাদীরা এখন মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক মুখ হয়ে উঠেছে ▯ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ▯ ৪৫

বাঙ্গালি হিন্দু গণহত্যা এবং আমাদের ইতিহাসবিমুখতা ▯ স্বর্ণাভ মিত্র ▯ ৪৭

বঙ্গভাগের ইতিবৃত্ত ▯ শালিবাহন ভট্টাচার্য ▯ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩০, ৪২ ▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ স্মরণে : ৪৬ ▯ শব্দরূপ : ৫০

প্রকাশিত হবে
৫ এপ্রিল
২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৫ এপ্রিল
২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মমতার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বনাম বাঙ্গলার প্রাপ্তি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে তারই একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ। সঙ্গে থাকবে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে ২০২১-এর ভোটযুদ্ধে বিজেপির ফল কেমন হতে পারে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন। লিখবেন--- ড. রাজলক্ষ্মী বসু, হীরক কর, বিশ্বপ্রিয় দাস প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নির্বাচনে নাটক কাম্য নহে

নির্বাচন হইল গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হইবার পূর্ব হইতেই রাজনৈতিক দলগুলি তাহাদের প্রচারমূলক কার্যকলাপ জোর কদমে শুরু করিয়াছে। বিগত ৪৪ বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী পরিবেশের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। ৩৪ বৎসর বামেরা এই কাজ করিয়াছে এবং গত দশ বৎসর ধরিয়া বর্তমান শাসকদল অতি নগ্নভাবে করিতেছে। নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আট দফায় ভোট গ্রহণ ঘোষণা করিয়াছে। ইহাতে শাসকদল নির্বাচন কমিশনের মতো স্বশাসিত সংস্থাকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়াছে। কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে রাজ্যের মানুষ পালাবদল চাহিতেছে। সাধারণ মানুষ আর কোনোভাবেই হিংসাকে বরদাস্ত করিবে না। বাস্তবিকই রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের প্রতি রাজ্যবাসী বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আর তাহাতেই প্রমাদ গুনিতেছে রাজ্যের শাসকদল। সেইজন্য তাহারা নির্বাচনী প্রচারে অকথা-কুকথার বান বহাইতেছে, সংখ্যালঘু তাস খেলিতেছে, প্রাদেশিকতার আবেগ খাড়া করিতেছে। তাহাতেও যখন কাজ হইতেছে না, তখন মিথ্যা নাটকের অবতারণা করিতে হইতেছে। নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ঘটনাকে 'হামলা' বলিয়া সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করিতে হইতেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও যখন এই দুর্ঘটনাকে হামলা বলিতেছেন তাহা মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী দাবি করিয়াছিলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির চার-পাঁচজন দুষ্কৃতী তাঁহাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সংবাদমাধ্যমকে নন্দীগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাইয়াছেন, ইহা দুর্ঘটনা মাত্র। রাস্তার ধারে লোহার খুঁটিতে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির খোলা দরজার আঘাতে তিনি আহত হইয়াছেন। ঘটনার পর জেলা শাসক ও পুলিস সুপার অকুস্থল পরিদর্শন করিয়া, স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলিয়া নির্বাচন কমিশনের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতেও দুর্ঘটনার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজ্যের মুখ্য সচিবও হামলার অভিযোগ খারিজ করিয়াছেন। সুতরাং, নাটক জমিতেছে না এবং মানুষ তাঁহার নাটক ধরিয়া ফেলিয়াছেন বুঝিতে পারিয়াই তিনি ঘটনার পরদিন হাসপাতালের বিছানায় শুইয়া বিবৃতি দিয়াছেন, ভিড়ের মধ্যে মানুষের চাপেই গাড়ির দরজার ধাক্কায় তাঁহার আঘাত লাগিয়াছে। এইখানেই নাটকের যবনিকা পড়িয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শেষ হইয়াও শেষ হইল না। তৃতীয়দিন তাঁহার পায়ের প্লাস্টার কাটিয়া ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা হইল। তাহার পরদিন তিনি হুইল চেয়ারে বসিয়া ব্যান্ডেজ বাঁধা পা উন্মুক্ত রাখিয়া নির্বাচনী প্রচারে বাহির হইলেন এবং নাটকীয় ভঙ্গিতে বলিতে শুরু করিলেন বিজেপি তাঁহাকে প্রাণে মারিবার চক্রান্ত করিয়াছিল ।

এখন প্রশ্ন হইল, শাসকদলের প্রধান তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নির্বাচনী বৈতরণী পার হইবার জন্য এমন নাটকের অবতারণা কেন করিতে হইল এবং কেন তাঁহাকে এত মিথ্যাকথার ফুলঝুরি ছুটাইতে হইতেছে? শাসকদলের নির্বাচনী প্রচারের বিষয়বস্তু তো হওয়া উচিত গত পাঁচ বৎসরে তাহারা রাজ্যের কী কী উন্নতি করিয়াছে? বিগত নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে রাজ্যের মানুষের চাহিদা কতটা পূরণ করিতে পারিয়াছে? আসলে তাহাদের কাছে এই বিষয়ে কোনো ইতিবাচক উত্তর নাই। দশ বৎসরে তোলাবাজি, কাটমানি, সিন্ডিকেটরাজ ও স্বজন পোষণ করিয়া রাজ্যটিকে তাহারা একেবারে শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যের মানুষ বিজেপির প্রতি আস্থা রাখিতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, মনোমতো প্রার্থী না হওয়ায় কোথাও কোথাও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা শুধু বিক্ষোভ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন না, দলীয় কার্যালয়ও ভাঙচুর করিতেছেন। ইহা মোটেই একটি শৃঙ্খলাপরায়ণ দলের পক্ষে শুভ লক্ষ্মণ নহে। তাহাদের ভাবিতে হইবে, মানুষ যখন বর্তমান শাসকদলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া বিজেপির উপর ভরসা রাখিতে শুরু করিয়াছে, তখন এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপ পুনরায় সেই অপশাসনকেই আহ্বান করিতেছে না তো? এই ভাবে কি তাহারা নৈরাজ্যসৃষ্টিকারীদেরই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পথ প্রশস্ত করিতেছেন না? এই মুহূর্তে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হইল রাজ্যে নৈরাজ্যের অবসানকল্পে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ দূরে রাখিয়া প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীকেই জয়যুক্ত করিতে হইবে।

সুভাষিতম্

স্বদেশে কষ্টমাপন্নে উদাসীনাস্তু যে নরাঃ।

নৈব চ প্রতিকুর্বন্তি তে নরাঃ শত্রুনন্দনঃ।

দেশ যখন সংকটের মধ্যে থাকে, তখন যারা প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে উদাসীনভাবে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, তারা শত্রুদেরই আনন্দবর্ধন করে থাকে।

পা-পালা-পাতাল

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে নাট্য রূপান্তর)

সুন্দর মৌলিক

দৃশ্য-১

স্থান—নন্দীগ্রামের বাজার

সংলাপ (দিদি কণ্ঠ)

ওগো আমায় ঠেলে ফেলে দিলো গোওওওও...। চক্কান্তো। আমি বলছি চক্কান্তো (সঙ্গে গোঁ গোঁ শব্দ)। চারপাঁচজন মিলে এলো আর ঠেলে ফেলে দিল। আমার বুকে লেগেছে, মাথায় লেগেছে। গায়ে জ্বর এসে গেছে। (পাশ থেকে সাংবাদিকদের আহা উহু শব্দ)।

দৃশ্য-২

স্থান—নন্দীগ্রাম টু কলকতা

সংলাপ (দিদি কণ্ঠ)

জোরে গাড়ি চালাও। জোরে আরও জোরে। আরও জোর। হর্ন বাজাও বারবার।

আমি আর পারছি না। সকাল থেকে অনেক মন্দিরে পুজো দিয়েছি। এবার রেস্ট নিতে হবে। চালাও গাড়ি। গ্রিন করিডোর করে দিতে বলেছি। লাল, নীল, সবুজ সব বাতি জ্বেলে দাও। খালি গেরুয়াটা জ্বালবে না।

দৃশ্য-৩

স্থান---কলকাতার সরকারি হাসপাতাল

সংলাপ (দিদি কণ্ঠ)

কেউ যেন ঢুকতে না পারে। নীল রঙের চাদর দিয়ে ঢেকে দে আমায়। সবাই দেখতে আসার আগে প্লাস্টার করো। না, না এক্সরে টেক্সরে করতে হবে না। আমি তো বলছি ভেঙে গেছে। গুঁড়িয়ে গেছে। ববিকে বলে দেব একটা ভাঙা পায়ের এক্সরে প্লেট এনে দিয়ে দেবে। তবে সেটা দেখে নিতে হবে। বাঁ পায়ের আনে যেন। তোমরা ততক্ষণে একটা মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করো। আমার মাথাটাও স্ক্যান করে নাও। ঠোকা লেগেছিল বলেছি। একটা প্রুফ রাখতে হবে তো।

দৃশ্য-৪

স্থান—কলকাতার সরকারি হাসপাতাল

সংলাপ (দিদি কণ্ঠ)

ক্যামেরাটা এমন করে লাগাও যাতে আমায় অসুস্থ লাগে। দাঁড়াও। আগে গলাটা বদলে নিই। শোনো অডিয়োটা আস্তে করে রাখো। যাতে মনে হয় আমার গলা দিয়ে স্বর বের হচ্ছে না। নাও এ বার বলছি। শোনও কাল যা বলেছি তাই বলব না। আজ বলব গাড়ির দরজায় ধাক্কা। চক্কান্তর কথাটা শুধু বাইরে বলব। মদন-টদনকে বিশ্বাস নেই। ওরা হইহল্লা করে কারও পা-টা এই সময় ভেঙে দিলে আমি কেস খেয়ে যাব।

দৃশ্য-৫

স্থান—কলকাতার বেসরকারি হাসপাতাল

সংলাপ (দিদি কণ্ঠ)

হ্যালো। হ্যাঁ ববি বলছিস? বাইরের হাওয়া কেমন? কেউ বিশ্বাস করছে না? শোন ব্যাপারটা ভালো করে খাওয়াতে হবে। পুরসভার হুইলচেয়ার নিয়ে আয়। যেমন সেই ভাড়া করে স্কুটি এনেছিলি সেই রকম। নীল-সাদা রং করা হুইল চেয়ার আনিস। আর শোন রুজিকে বল আমায় যেন একবার দেখতে আসে। সেন্টুটা খাওয়াতে হবে। কয়লা, গোরু সব জানাজানি হয়ে গেছে। অভিটা তো একটা আস্ত গা...। বউটাকে সামলাতে হবে আমাকেই।

দৃশ্য-৬

স্থান—কালীঘাটের টালির বাড়ি

সংলাপ (দিদি কণ্ঠ)

লতা, এদিকে আয়। শোন একটা কম বহরের শাড়ি নিয়ে আয়। কেন? তুই বুঝবি না। আমি প্রথম দিকে স্টেজে ওঠার সময় ইচ্ছে করে হাওয়াই চটি ছিড়ে ফেলতাম। মঞ্চে উঠে সেফটিপিন লাগাতাম। হেব্বি হাততালি পড়ত। শোন ছোটো শাড়ি দে না হলে পায়ের ব্যান্ডেজটা দেখানো যাবে না। ডাক্তারটাকে বললাম, কালারিং ব্যান্ডেজ দিতে, ভালো ছবি উঠবে। শা... দিল না। বলল নেই।

দৃশ্য-৭

স্থান—কলকাতার রাজপথ

সংলাপ (দিদি কণ্ঠ)

আস্তে ঠেল। না হলে, লোকে ডামাটা ধরে ফেলবে। এই, ক্যামেরার সামনে

আসছিস কেন। ভালো করে ছবিটা তুলতে দে ওদের। মালগুলো তো আবার টিপ্পনী কাটতে পারে। শোন, একটা ক্যামেরাম্যানকে আমার ডান পায়ে না না, সরি বাঁ পায়ে (স্বগোতোক্তি-কোনটা ভেঙেছে মনেও থাকে না সব সময়) ফোকাস করে ছবি তুলতে বল। ওটা দিয়েই পোস্টার টোস্টার সব হবে।

দৃশ্য-৮

স্থান—প্রচার মঞ্চের পিছনে

সংলাপ (দিদি কণ্ঠ)

এই কে আছিস, কাছে আয়। আমার পাটা এমন করে সেট করে দিবি যাতে সবাই দেখতে পায়। লোকজন তো বেশি নেই। সবাইকে কাছে ডেকে নে। সবাই আমার পা

দেখুক। ব্যান্ডেজটা যেন সব সময় দেখা যায়। দাঁড়া তো, একটা সেফটিপিন দে আমায়। পায়ের ওপর দিকে শাড়িটা তুলে সেফটিপিন লাগিয়ে দিই। তাহলে সুরুৎ করে নেমে যাবে না। নেমে গেলে হবে না। আর সুব্রত শোন, নন্দীগ্রামে যে বাড়িটা ভাড়ায় নিয়েছিস ওটা তো দোতলা। ওপরে উঠলে লোকে যা তা বলবে। শোন, আজকেই নীচের ঘরে এসি লাগিয়ে দে। আর শোন, আমায় হুইলচেয়ারটার সঙ্গে একটু বেঁধে রাখ। উত্তেজনায় যদি একবার মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ি তবে খেলা ওখানেই শেষ হয়ে যাবে। তবে ভাবছি, শেষের দিকে এক পায়ে দাঁড়াব। পোধানমন্ত্রীর মতো আসন করব। ওটার নাম দেব সিঙ্গল পদাসন।

দৃশ্য-৯

স্থান—ভোটের মঞ্চ

সংলাপ (দিদি কণ্ঠ)

হ্যালো পিকে? সময় মতো ফোন কিউ নেই ধরতা। শুনো, তুম যো লিখ দিয়া ওই আমি বলেঙ্গে। আমায় ওরা মেরেছে। দরজাটাও ওদের লোক। বহিরাগত দরজা। নিশ্চয়ই গুজরাটে তৈরি। ওই দরজাকে আমি ছেড়ে কথা বলব না। আমি এক পায়ে লাথি মারব। এমন লাথি মারব বলে যে ছক্কা হয়ে যাবে। আমি একটা গাধা। দরজাটাকে বিশ্বাস করেছিলাম। নাড্ডা, ফাড্ডা, গাড্ডা, হোদলকুতকুত, কিম্ভুতকিমাকার সবকটা বাঙ্গলায় এসে গেছে। পা নিয়ে ওরা কিছু বলতে পারবে না। আমি সারাদিন রাত পা-পা-পা করে যাব। সিপিএম আমার মাথায় মারত। ওরা পায়ে মারছে। মাথায় মার খেয়ে আমি ক্ষমতার মাথায় উঠেছি। পায়ের মারে আমায় পাদানিতে ফেলতে চাইছে।

দৃশ্য-১০

স্থান—মঞ্চের সামনে

সংলাপ (শিশু কণ্ঠ)

ও মা, আমায় ওই রকম একটা ব্যান্ডেজ কিনে দেবে। ও মা, দাও না। দিদির মতো একটা ব্যান্ডেজ। আর একটা হুইলচেয়ার। আমিও খেলব। হুইলচেয়ারে বসে খেলব। দিদিও তো খেলছে। দাও না মা দাও না। কিনে দাও না। আমি বসে থাকব। দাদা ঠেলবে। আমি বলব চক্কান্ত, চক্কান্ত। ও মা, দাও না কিনে। সত্যি বলছি, আর কোনও বায়না করব না। ভ্যা অ্যা অ্যা...। (ছোঁয়াচে রোগের মতো একের পর এক বাচ্চা কাঁদতে

কাঁদতে বায়না করতে থাকে)।

দৃশ্য-১১

স্থান— মাইকে ঘোষণা

সংলাপ (সচিব কণ্ঠ)

অনুগ্রহ করে শুনবেন। বাচ্চাদের সামলান। এই মাত্র দিদি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ক্ষমতায় এলে রাজ্যে 'ঠেলা-খেলা' প্রকল্প চালু করা হবে। বাচ্চারা সবাই শান্ত হয়ে যাও। সব বাচ্চাকে একটি করে হুইলচেয়ার দেওয়া হবে। চাইলে ব্যান্ডেজও দেওয়া হবে। স্কুলে স্কুলে হুইলচেয়ার দেওয়া হবে। সব থানায় পুলিশ হুইলচেয়ার বসবে। আমরা নতুন প্রকল্প আনব, হুইলচেয়ারে সরকার। সরি, দুয়ারে হুইলচেয়ার। স্লোগান হবে– 'হুইল পাওয়ার ইজ দ্যা সিক্রেট অব সাকসেস'।

শেষ অঙ্ক

মাইকে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল শুরু হয়ে যায়। হাসি একসময়ে কোলাহলে পরিণত হয়। মাইকের ঘোষণা আর মানুষের কোলাহল, শিশুর উল্লাস মিলে মিশে এক নতুন ধ্বনির জন্ম দেয়। মানুষ হাসছে না কাঁদছে বোঝা মুশকিল হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে পর্দা নামতে থাকে। ভেসে আসে আবহ সংগীত— আমার মাথা নত করে দাও গো দিদি, তোমার চরণধুলার তলে...

(কোনও চরিত্র কাল্পনিক নয়)

অতিথি কলম

সজ্জন কুমার

মমতার জাতিভেদের রাজনীতির কারণে বিজেপি বিকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে

> মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র মেরুকরণের আবহে বামপন্থীদের আক্রমণাত্মক কট্টর মৌলবাদী মুসলমান ফতোয়াধারী দলের সঙ্গে হাত মেলানো তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার শেষ সুযোগটাও ছিঁড়ে নিয়েছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে লালিত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ভোটবাক্স বাঁচাতে জলাঞ্জলি দিয়েছে। ...মমতা ব্যানার্জির নির্লজ্জ তুষ্টিকরণ ও অবহেলার ভ্রান্ত রাজনীতিরই এগুলি চরম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির জাত-পাতের পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির পরিসর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বরাবর আলাদা থাকার দাবি এবার সম্পূর্ণ নস্যাৎ হয়ে গেছে। আসন্ন নির্বাচনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল বিজেপি উভয়েই অন্য রাজ্যগুলির পথই ধরেছে। এ কথার সর্বশেষ প্রমাণ পাওয়া গেছে বাঙ্গলার মাহিষ্যদের ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতির মধ্যে দিয়ে। অবশ্য এর সঙ্গে আরও তিনটি অনগ্রসর সম্প্রদায় রয়েছে। মমতা ব্যানার্জি বিজেপির দেওয়া এই প্রতিশ্রুতিকে তাঁর দলের নির্বাচনী ইস্তাহার থেকে নকল করা বলে ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্ন ওঠে, কবে থেকে বাঙ্গলায় জাতপাতের রাজনীতি এমন প্রাধান্য পেতে শুরু করল। দীর্ঘকাল ধরে বাঙ্গলা ও ওড়িশা এই জাতপাতের রাজনীতি কেন্দ্রিক ভোট বিভাজন নিজেদের রাজ্যে প্রয়োগ করেনি যা ভারতের অন্য রাজ্যগুলির ভোট প্রক্রিয়ার আব্যশিক অঙ্গ ছিল। ওড়িশা এখনও জাতিগত পরিচয়কে রাজনীতিতে প্রবেশ করতে না দিলেও বাঙ্গলার ক্ষেত্রে তা আর বলা যাবে না। ২০১১ সালে বাম জমানার বিলুপ্তির পর ধীরে ধীরে এই বিভাজনের মাধ্যমে রাজনৈতিক লাভ ওঠানোর প্রক্রিয়ার পত্তন। তুষ্টিকরণের মাধ্যমে যার প্রচ্ছন্ন রূপ দেয় তৃণমূল।

২০১১ সালে তৃণমূলের জয় যে জিনিসগুলির সমাহারে হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান মমতার ব্যক্তিগত আবেদন, তীব্র বাম বিরোধী যৌথ নাগরিক মানসিকতা এবং কিছু কাকতালীয় ঘটনা। যেমন পরস্পর বিরোধী শক্তি নকশালপন্থী ও মূল ধারার মানুষ, দলিত ও মুসলমান সকলেই তৃণমূলকে অবাধ সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা হস্তগত করার পরই মমতা বামেদের সমর্থন একত্রিত রাখার তত্ত্ব থেকে আমূল সরে আসেন। দল শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে। পরিবর্তে বর্ণ ও সম্প্রদায় ভিত্তিক রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরে। মানুষের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সবই সম্প্রদায় ভিত্তিক বড়ো ধাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরীক্ষা চলে। তথাকথিত সংখ্যালঘুদের বাইরে রাজবংশী ও গোর্খাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নানা পৃথক বোর্ড গঠন করে প্রলুব্ধ করা হয়। এখানে রাজ্য সরকার ঢালাও টাকা দিতে থাকে। নদীয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনার একটা বড়ো অংশে প্রভাবশালী নমশূদ্র দলিত মতুয়াদের বড়ো মা-কে তোল্লাই দিয়ে নির্দিষ্ট সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিতকরণ শুরু হয়। এপ্রিল ২০১২ থেকে মুয়াজ্জিম ও ইমাম ভাতা চালু করে মুসলমান সম্প্রদায়কে তাঁবেদার করার একান্ত ধর্মভিত্তিক কৌশল নেওয়া হয়। বাংলা জামাত উলেমা হিন্দের মতো মৌলবাদী মুসলমান দলের নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা ত্বহা সিদ্দিকিদের মতো ধর্মীয় কট্টরবাদীদের কাছে টেনে মুসলমান ভোট সুনিশ্চিত করা হয় যাতে তারা কোনো মতেই আর কংগ্রেস বা সিপিএমে না ফিরে যায়। এই ধরনের লাগাতার এক চোখো রাজনৈতিক কার্যকলাপ স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যে বিজেপির একটি সম্ভাব্য রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার পথ সুগম করে।

২০১৮ সালের আগে মমতাদেবীর রাজনৈতিক কৌশল এটাই ছিল, যে কোনো

মূল্যে বামদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে কেননা মুসলমানদের ৩০ শতাংশ ভোটে তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হয়েছে। কাজটা করতে গিয়ে তিনি বিজেপির অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন। ভেবেছিলেন, শুধু সিপিএম রাজনৈতিক ভাবে অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়লেই তাঁর নির্বাচনী লাভ ঘরে তুলতে কোনো অসুবিধে হবে না। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু হায়! তাঁর এই কার্যকলাপই পশ্চিমবঙ্গে একটি নতুন বিকল্পের জন্ম দিচ্ছিল যার নাম বিজেপি।

বিজেপির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশ সম্প্রদায় ভিত্তিক রাজনীতির প্রসার শুরু হয়। কালক্রমে তা তীব্র ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের চোখে তিনি মুসলমান দরদি বলে প্রতিপন্ন হয়ে যেতে থাকেন যা থেকে বাঁচতে তাকে কিছুটা ভারসাম্যের ভেক ধরতেই হয়। তিনি পুরোহিত ভাতা চালু করা থেকে দুর্গাপুজোর ক্লাবগুলিকে রাজ্যবাসীর করের টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা করে বিলোতে থাকেন। এর আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল এরা ভোট বাজারে তাঁর হয়ে লড়াই করতে বাধ্য থাকবে। এই কৌশলগুলির সঙ্গে একইসঙ্গে চলছিল ব্যাপক দানছত্রের মেলা। বিভিন্ন প্রকল্পের নাম করে দলের লোকদের নানা কিছু পাইয়ে দেওয়ার সঙ্গে উপচে পড়ত দুর্নীতি ও লুট। এই প্রকল্পও ক্রমে দলীয় তোষণে পরিণত হওয়ায় সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণই আবার কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে আসে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ২০১১-এর লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা দল হিন্দু জাতিভিত্তিক রাজনীতির ভাবকল্পনা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রাসঙ্গিক করে তোলে। শ্রেণীভিত্তিক ভেদাভেদের রাজনীতি পিছিয়ে পড়ে। বর্ণ ও সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতি কৃষক নীতি ও নির্বাচনের পরিসরে প্রভূত গুরুত্ব পেতে থাকে। বিজেপি এই আত্ম পরিচয়ের রাজনীতিকে একটি বৌদ্ধিক ও ঐতিহাসিক মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। যথাযথ সাংগঠনিক পরিকাঠামো প্রস্তুত না থাকায় দল সরাসরি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুত্বের আবেদনের কথা তুলে ধরতে থাকে। বৃহত্তর হিন্দুত্বের ধাঁচার মধ্যে সকলকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই কাজে দল যথেষ্ট সফল হয়। বৌদ্ধিক ও তাত্ত্বিক মূল্যায়ন ভিত্তিক হিন্দু জাতির গৌরবগাথা জনসভা, পুস্তিকা ও প্রচারের মাধ্যমে হিন্দুদের অভ্যন্তরীণ বিভেদ অনেকাংশেই মুছে দেওয়া হয়। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আদি হিন্দু জাতির রূপকল্প তৈরি হয়। এক্ষেত্রে তোষণবাদী হিসেবে তৃণমূল প্রকট ভাবে উপস্থিত থাকায় তাদের বাস্তব স্তরে ও সংস্কৃতিগতভাবে বিরোধী শক্তিও প্রতিপন্ন করতে সুবিধে হয়।

অন্যদিকে ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এক তৃতীয়াংশ আসনে বিরোধী প্রার্থী না দিতে দেওয়ার সময় থেকেই তৃণমূল সম্পর্কে জনমানসে একটি স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের ছবি ফুটে উঠতে থাকে। একই সঙ্গে সরকারটি যে আদতে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে মুসলমান স্বার্থ দেখতে অত্যুৎসাহী তাও লোকে বুঝে যায়। তাহলে ত্র্যহস্পর্শযোগ হলো দুর্নীতি, নিপীড়ন ও তুষ্টিকরণ।

এই পরিস্থিতিতে বিজেপি বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভালো দিকগুলি তাদের মনে নতুন করে জাগিয়ে তোলে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিকড়ের সন্ধান দেয়। তারা যে হিন্দু একথা অকপটে বলার পর্যাপ্ত সাহস তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এর ফলে ক্রমশ তৃণমূল কোণঠাসা হতে থাকে। এটা বোঝা যায় যখন উত্তরবঙ্গের বিশাল সংখ্যার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা নমঃশূদ্র ও রাজবংশী দলিতরা নিজেদের সেখানকার ভূমিপুত্র বলে দাবি করতে থাকে। তারা সিএএ ও এনআরসি আইনের কোনো বিরোধিতা এবং উভয়ের মধ্যে তফাত করেনি। তাদের কাছে এই আইন দীর্ঘদিন থেকে ঝুলে থাকা বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আটকানোর অস্ত্র।

লক্ষণীয়, হিন্দু উদ্বাস্তুরা কখনই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গণ্য হবে না যদিও তারাই বিপুল সংখ্যায় সীমান্ত পার হয়েছে। একই ভাবে বিজেপি ও মতুয়াদের মধ্যে যে সখ্য গড়ে উঠেছে তা পারস্পরিক প্রয়োজনেই এবং সকলেরই তা জানা। এই সূত্রে পুরুলিয়ায় 'জয় শ্রীরাম ধ্বনি'র মাধ্যমে বিজেপি তিনটি ভিন্ন হিন্দু সমাজের সমর্থন একজোট করতে পেরেছে। এরা হলো মাহাতো, কুর্মি, কুম্ভকার (যারা মাটির বাসন খেলনা তৈরি করে)। এই একটি কৌশলে তারা কলকাতার এলিট পরিমণ্ডলের বাইরে থাকা কৃষক সম্প্রদায় যাদের মধ্যে মাহিষ্যের সংখ্যাধিক্য রয়েছে এবং সেই সঙ্গে আগুরি, গোয়ালা ইত্যাদিদেরও বৃহত্তর হিন্দুত্বের ছত্রছায়ায় আনতে পেরেছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আসানসোল ও দুর্গাপুরের হিন্দিতে কথা বলা গরিষ্ঠাংশ মানুষ ও বাঙ্গালি হিন্দুরা একই ধরনের সেন্টিমেন্ট পোষণ করে। তারা হিন্দুত্বকে আদৌ খাটো করে দেখে না। এ সূত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম শহরের রাজধানী কলকাতার প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকা বাঙ্গালি অস্মিতা ও বৈশিষ্টের একান্ত ধ্বজাধারীরা। তারা মনে করে তাদের কাছে হিন্দুত্ব এখনো গ্রহণযোগ্যতাহীন। এরাই ব্যতিক্রমী বাঙ্গালি সংস্কৃতিবান ভদ্রলোক ও বাঙ্গালিয়ানার একচ্ছত্র ধ্বজাধারী।

এরই ফলে মান্যতা পেয়ে যায় এ যাবৎ দূরে রাখা তুলনায় কম মার্জিত কম শিক্ষিত ভূমিপুত্রদের হিন্দুত্বকে আঁকড়ে ধরার আকাঙ্ক্ষা। তাদের কাছে অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য বিকল্প কেউ খাড়া করতে পারেনি। এই তীব্র মেরুকরণের আবহে বামপন্থীদের আক্রমণাত্মক কট্টর মৌলবাদী মুসলমান ফতোয়াধারী দলের সঙ্গে হাত মেলানো তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার শেষ সুযোগটাও ছিঁড়ে নিয়েছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে লালিত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ভোটবাক্স বাঁচাতে জলাঞ্জলি দিয়েছে। ২ মে ফলাফল যাইহোক না জাতিগত পরিচয় ভিত্তিক রাজনীতি বরাবরের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে স্থান করে নিয়েছে। হায়! মমতা ব্যানার্জির নির্লজ্জ তুষ্টিকরণ ও অবহেলার ভ্রান্ত রাজনীতিরই এগুলি চরম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

বিজেপির ইস্তেহার ও নারীশক্তির জাগরণ

বিশ্বামিত্র

বিজেপি এবারের রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছে গত ২১ তারিখে। অন্য দুই প্রতিপক্ষ সংযুক্ত মোর্চা ও তৃণমূলও ইতিমধ্যেই তাদের ইস্তেহার প্রকাশ করে ফেলেছে। নির্বাচনী ইস্তেহার নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে বহু বছর ধরে অভিযোগ তাঁরা ইস্তেহারে যা প্রতিশ্রুতি দেন তা রাখেন না। আসলে ভোট বৈতরণী পেরোনোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে কায়েমি স্বার্থ বিগতদিনগুলিতে সবসময়ই বেশি গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। যে কারণে ভোটব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে নানারকম ভাবে। নির্বাচকমণ্ডলীর মৌলিকত্ব নষ্ট করে তাদের ভোটযন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। তার কুপ্রভাব শুধু ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই পড়েনি ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছে।

ইস্তেহারের এই খারাপ দিকটা দেশবাসী জানেন না তা নয়। আর জানেন বলেই তা নিয়ে ঠাট্টাতামাশায় মেতেও ওঠেন। বিজেপির ইস্তেহার নিয়ে বিশেষ কিছু বলার সময় এখনও আসেনি। ক্ষমতায় এলে প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে পারে কিনা তা সময়ই বলবে। কিন্তু এই ইস্তেহারের কিছু প্রতিশ্রুতির কথায় বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ণের ব্যাপারে আমাদের আসতেই হবে।

প্রথমত, সরকারি চাকরিতে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ ও দ্বিতীয়ত, বিধবাদের ৩ হাজার টাকা ভাতা প্রদান। এবার মনে রাখতে হবে লড়াইটা নিছক নির্বাচনী নয়। হিন্দুর ভিটেমাটি রক্ষার লড়াইও বটে। খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ইজেডসিসিতে দাঁড়িয়ে বিজেপির ইস্তেহারে ঘোষণা করেছেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এনে প্রতিটি হিন্দুর নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত করবেন।

এবার ভোটের যা হাওয়া তাতে বিজেপির বিপুল আসন-প্রাপ্তি নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু '৪৬-এর পদধ্বনিও যে শোনা যাচ্ছে। তাই ঘরপোড়া গোরু হিন্দুরা সিঁদুরে মেঘ দেখবেই। সেদিন কমিউনিস্ট পার্টি ও মুসলিম লিগ মিলে বাঙ্গালি হিন্দুর সর্বনাশ করেছিল। আজকের দিনেও সেই চিত্রনাট্য হুবহু সাজানো হয়েছে, শুধু মুসলিম লিগের পরিবর্তে আজ ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের আবির্ভাব হয়েছে। তফাতটা হচ্ছে, শুধু তফাত বলবো না, খুব ভয়ংকর রকমের তফাত বলাই উচিত হবে যে, সেদিন মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তির কোনও মুখোশ ছিল না, আজ আছে। আজ সেকুলারিজমের মুখোশ আছে। এই সেকুরালিজমের মুখোশের বিপদ সম্বন্ধে বাঙ্গলার গ্রামগঞ্জের হিন্দুরা অন্তত অজ্ঞ নন। উলুবেড়িয়া, দেগঙ্গা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের হিন্দুদের হাল আমলেই সেকুলারিজমের ভয়াবহতার চূড়ান্ত বিপদের মুখোমুখি হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে।

আব্বাস সিদ্দিকির প্রধান লক্ষ্য কংগ্রেসকে অবলম্বন করে সিপিএমের সাহায্যে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করা এবং তারপরে দেশের সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শরিয়তি ব্যবস্থা লাগু করা। এবং দেশের মধ্যে একটি ইসলামি ব্যবস্থায় চলা অঙ্গরাজ্যের জন্ম দেওয়া। যা দেশের সুস্থিতি প্রয়োজনমতো নষ্ট করতে পারে। আব্বাসের একজন কট্টর ইসলামি ধর্মগুরু হিসেবে বিবৃতিগুলি, যেগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে তাতে এই ধরনের লক্ষ্য যে তার আছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন উপলক্ষ্যে যে রাজনৈতিক ইস্তেহার প্রকাশ করেছে তাতে নারীর ক্ষমতায়ণ বা মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতির গুরুত্ব রয়েছে। হিন্দুসমাজে নারীর অগ্রণী ভূমিকার কথা চিরদিনই স্বীকার করা হয়েছে। পৌরাণিক যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা থেকে উনিশ শতকে ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় অবধি সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। সুদীর্ঘ ৮০০ বছর মুসলমান শাসনে হিন্দুসমাজে যে রক্ষণশীলতা প্রবেশ করেছিল, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে তা যে একটি আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে সমাজ গ্রহণ করেছিল, তা আজকে স্বীকার করতেই হবে। অথচ মহিলাদের সম্বন্ধে হিন্দুসমাজ অনুদার, চরম রক্ষণশীল, গোঁড়া এই জাতীয় কথাবার্তা বলে, বিভ্রান্তিকর ইতিহাস পড়িয়ে, ব্রাহ্মণ্যবাদের কাল্পনিক তত্ত্ব খাড়া করে কমিউনিস্টরা বাঙ্গলার সাধারণ মা-বোনেদের জেএনইউ- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালতে না পেরে তাদের পশ্চাৎপট বানিয়ে বাঙ্গলার নারীশক্তিকে ক্রমাগত অপমান করা ছাড়া আর কিছুই করেনি। এমনকী রামকৃষ্ণদেব- বিবেকানন্দকেও নারীবিদ্বেষী রূপে কিছু অত্যুৎসাহী বামেরা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই কারণে তাদের দলে এতবছর বাদেও সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক কমিটি পলিটব্যুরোয় একমাত্র বৃন্দা কারাত বাদে কোনও মহিলা নেত্রী জায়গা পান না।

বিজেপির এই নারীশক্তির জাগরণ নিয়ে কিছু বললে বিরোধীরা টেনে আনে হাতরাস, সায়নী-দেবলীনার প্রসঙ্গ। একটা কথা মনে রাখতে হবে, তাদের ইস্তেহারে নারীশক্তি জাগরণের কথা আছে বলেই ঘুণ ধরা সমাজের মানসিকতা পালটে যাবে এই দাবি অতি বড়ো বিজেপি সমর্থকও করবে না। হাতরাস বা সায়নী-দেবলীনার ক্ষেত্রে ঘটনাগুলো সমাজের অসুস্থ মানসিকতার ইঙ্গিত বলেই বিবেচনা করতে হবে। এর সঙ্গে বিজেপির কোনও দলগত সম্পর্ক নেই। আর সায়নী-দেবলীনাকে হুমকি যে, হিন্দুসমাজের কোনও ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়ায় কিছু ছেলেছোকরার তাৎক্ষণিক আক্রোশ এটাও মনে রাখতে হবে, তবে কোনওমতেই ওই ধরনের হুমকিমূলক অশ্লীল কথাবার্তাকে বরদাস্ত করা যায় না।

বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহারের অন্যান্য বিশেষ গুণাবলী নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু মহিলাদের ক্ষমতায়ণ, স্বনির্ভর করার যে লক্ষ্য নিয়ে দল তার দর্শনগত আদর্শের পরিচয় দিয়েছে তার সাধুবাদ দিতেই হয়। ▯

এবারের বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

সাধন কুমার পাল

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। ঠিক যেমন কট্টর মুসলমান ধর্মগুরু আব্বাস সিদ্দিকি তার দলের নাম রেখেছেন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)। তবে এই ধরনের নাম রাখার ক্ষেত্রে কোনো নতুনত্ব বা চমক নেই। বিগত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে এমন একটি পরিবেশ নির্মাণ করা হয়েছে যে সেকুলারিজমের নাম নিয়ে ভারতবর্ষে তোষণের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করা, জেহাদি ক্রিয়াকলাপ চালানো কোনোটাই দোষের বলে গণ্য করা হয় না। সেকুলারিজমের তকমা নিয়ে এদেশে ভারতীয়ত্ব কিংবা হিন্দুত্বের উপর যে সমস্ত আঘাত ও আক্রমণ আসে তার সবকটিই প্রগতিশীলতা বলে গণ্য হয়। ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসের উপকণ্ঠে ৪৭ বছর বয়সি ভূগোল শিক্ষক স্যামুয়েল প্যাটিকে স্কুল শেষে ফেরার পথে ১৮ বছর বয়সি আব্দেল্লাখ আন্তসনভ নামে যুবক 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে দুই ফিট লম্বা একটি ছুড়ি দিয়ে আঘাত করে এবং শেষে তার শিরশ্ছেদ করা হয়। বিশ্বজুড়ে এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা হলেও জেহাদিরা এই যুবকের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের সুপ্রিমো আব্বাস সিদ্দিকিও ফ্রান্সের ওই ঘাতক জেহাদি যুবককে মহান বলে উল্লেখ করে তার সমকক্ষ হয়ে উঠার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন। করোনা মহামারীর সময় এই আব্বাস সিদ্দিকি ওর আল্লাহর কাছে এমন ভয়ংকর ভাইরাসের কামনা করেছিলেন যাতে ভারতে পঞ্চাশ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়। এহেন জেহাদি মানসিকতা সম্পন্ন আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া কংগ্রেস, সিপিএম ও তার লেজুড় বামদলগুলি মিলে টিকে থাকার অন্তিম মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছে। অবশ্য এই প্রথম নয়, এর আগে বিগত কয়েকটি নির্বাচনে ডুবন্ত এই দলগুলি নিজেরাই পরস্পরকে আকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে বিফল হয়ে এবার সবাই মিলে জেহাদি আব্বাসের শরণাগত হয়েছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেডের জনসভায় জেহাদি আব্বাসের বক্তব্য শুনে এবং তাকে ঘিরে যে সমস্ত দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সৌজন্যে সেই সমস্ত নাটকীয়তা দেখে এটা মনে হয়েছে যে, এই কট্টরপন্থী মুসলমান নেতা কংগ্রেস ও বামেদের রাজনৈতিক দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন এবং নিজেকে অনৈতিক জোটের অঘোষিত শেষ কথা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। জেহাদি আব্বাস মঞ্চে উঠার পর বাম নেতাদের আলিঙ্গনের দৃশ্য ও সমবেত জনতার উদ্দীপনা দেখে এটা মনে হয়েছে যে বাম নেতারা এবং এই কট্টরপন্থী নেতার অনুগামীরা যেন উদগ্রীব হয়ে ওর দর্শন ও আলিঙ্গন পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। জনতার 'ভাইজান, ভাইজান' চিৎকারে ভরে যায় ব্রিগেড। উচ্ছ্বাসের জেরে বক্তব্য থামাতে বাধ্য হন অধীর চৌধুরী। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি লক্ষ্য করেন, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু থেকে শুরু করে মহম্মদ সেলিম সকলেই আব্বাসকে আপ্যায়নে ব্যস্ত। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য কেউই শুনছেন না। মঞ্চে উঠে সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেও অধীরকে এড়িয়ে যান আব্বাস। দৃশ্যত বিরক্ত অধীর বক্তৃতা থামিয়ে মঞ্চ ছেড়ে নামার তোড়জোড় শুরু করেন। পরে ফেলেন মাস্কও। তাঁকে নেমে আসতে দেখেই ছুটে যান বিমান। কংগ্রেস নেতাকে আটকাতে এগিয়ে আসেন সেলিম-সূর্যও। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু হাত ধরে ডায়াসের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন তাঁকে। তখনকার মতো বিষয়টি মিটেও যায়। এরপর বক্তব্যও রাখেন অধীর। যদিও ততক্ষণে জোটের জোড়াতাপ্পি খুলে গিয়েছে।

গোটা ভাষণে বামেদের বন্ধু বলে উল্লেখ করে আব্বাস বললেন, 'যেখানে যেখানে বামপ্রর্থীরা দাঁড়াবেন, বুকের রক্ত দিয়ে তাঁদের জেতাব।' কিন্তু উহ্য থাকে হাত শিবির। এমনকী ভাষণে ফুরফুরা শরিফের পিরজাদার প্রচ্ছন্ন হুমকি বেশিদিন অপেক্ষা করব না। নিজেদের 'হক' ছিনিয়ে নিতে পারেন তারা। তিনি বলেন, 'ভাগীদার হতে চাই'। অন্যদিকে, অধীরের সামনেই ভাষণে কংগ্রেসকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের আব্বাস সিদ্দিকি। বললেন আব্বাস সিদ্দিকি, 'ভিক্ষা নয়, অধিকার চাই'। কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে আরও বলেন, 'যদি কেউ মনে করে বন্ধুত্বের হাত বাড়াবেন, তাহলে তাঁকে স্বাগত'। শেষে সবার উদ্দেশ্যে হুমকি 'দরকার হলে রক্ত দিয়েও মাতৃভূমিকে স্বাধীন করব।'

> আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে যদি কোনো কারণে ত্রিশঙ্কু ফলাফল হয় তবে বিজেপিকে ঠেকানোর নামে সমস্ত অবিজেপি দলগুলি যে একমঞ্চে এসে সরকার গঠনের প্রয়াস করবে এবং আব্বাস সিদ্দিকির মতো মোল্লারাই যে কিং মেকার হয়ে উঠবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ফঃ ২

ব্রিগেড সভার কয়েকদিন পরেই মধ্যগ্রামের পাটুলিয়ায় একটি জনসভা থেকে বিস্ফোরক দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রী কে হবে, সেটা আমিই ঠিক করব!' জেহাদি আব্বাস আরও বলেছেন '২০২১ সালে বামেদের সঙ্গে একটি সাময়িক জোট করছি ঠিকই তবে ওদের বিরুদ্ধেও প্রতিশোধ নেওয়া হবে।'

প্রশ্ন হচ্ছে, 'দরকার হলে রক্ত দিয়েও মাতৃভূমিকে স্বাধীন করব'--- আব্বাস সিদ্দিকির এই হুমকির অর্থ কী? জেহাদি আব্বাস কীসের স্বাধীনতা, কার স্বাধীনতার কথা বলছেন? আমরা তো জানি আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে, তাহলে এখন আবার কোন স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে? কীসের প্রতিশোধের কথা বলা হচ্ছে। দেশভাগের সময় আমরা অনেকেই জন্মাইনি; কিন্তু দেশভাগের ইতিহাস পড়েছি। আব্বাস সিদ্দিকির উত্তেজক ভাষণ সেই সঙ্গে বাম ও কংগ্রেস নেতাদের আত্মসমর্পণের দৃশ্য দেখে দেশভাগের মর্মান্তিক ইতিহাসের প্রত্যাবর্তনের পদধ্বনি যেন আবার শোনা যাচ্ছে।

৪৬ সালে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর আগে মুসলিম লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। সেই সময় জিন্নার ছবি দেওয়া একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছিল। জেহাদি আব্বাসের এই সমস্ত গরামাগরম হুমকির সঙ্গে সেই প্রচার পত্রের কথাগুলির যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সেই প্রচার পত্রে লেখা হয়েছিল, 'আমরা মুসলমানরা রাজমুকুট পরে দেশ শাসন করেছি। উৎসাহ হারাইও না। প্রস্তুত হও এবং হাতে অস্ত্র তুলে নাও। হে মুসলমানগণ একবার ভেবে দেখ আজ আমরা কাফেরদের অধীন। কাফেরদের ভালোবাসার পরিণাম ভালো নয়। হে কাফেরগণ, সুখ বা গর্ব অনুভব করিও না। তোমাদের শেষ বিচার বেশি দূরে নয়। সার্বিক ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে। আমাদের হাতের তরবারি দ্বারা বিজয়ীর বিশেষ শিরোপা অর্জন করব।' এর পরের ঘটনাক্রম আমাদের জানা। প্রথমে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এবং পরে নোয়াখালির আক্রমণ সংগঠিত করে হিন্দু নিধনের বর্বরতা সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে মুসলিম লিগের এই সমস্ত নারকীয়তার নিন্দা করা হয়েছিল এমন নজির নেই। বরং ইতিহাস বলছে, জ্যোতি বসু সেদিন (১৯৪৬) শহিদ মিনারের যে সভা থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়েছিল, সেই সভায় গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর নায়ক সুরাবর্দির সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের দাবি জানিয়েছিলেন। এখন যেমন আব্বাস সিদ্দিকিকে সিপিএম পার্টির তরফে সেকুলার বলা হচ্ছে ঠিক তেমনি সে সময়ও জিন্না ও মুসলিম লিগকে সেকুলার বলে দাবি করে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বলা হয়েছিল যে পাকিস্তান কখনোই সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নয়। (Nothing to do with pan islamism) এবং ভবিষ্যতে পাকিস্তান সেকুলার স্টেট হবে। (pakisthan and national unity : published by CPI in 1943)। সে সময় সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক পিসি যোশী পার্টির মুখপত্রে লিখেছিলেন, 'স্বরাজ যে ভাবে আমাদের জন্মগত অধিকার, পাকিস্তানও মুসলমানদের কাছে ঠিক একই অবিচ্ছেদ্য অধিকারের দাবি রাখে' (PC Joshi : People's war 20/8/42)। বর্তমান বাংলাদেশ যে অঞ্চল নিয়ে গঠিত, কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রে প্রকাশিত মানচিত্রে তার চেয়ে বেশি অঞ্চল নিয়ে পূর্বপাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের প্রকাশিত মানচিত্রে সমগ্র নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর ও ত্রিপুরা পূর্বপাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানানো হয়েছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতে ভারত বিরোধী সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মেলামেশা এর আগেও হয়েছে।

স্বাধীনোত্তর ভারতে কেরলে কমিউনিস্টরাই সর্বপ্রথম মুসলিম লিগের সঙ্গে সরকার গড়ে মন্ত্রিত্বের অংশীদার পর্যন্ত হয়েছিল। এর পরে লিগের দাবির কাছে মাথানত করে ইএমএস নামুদ্রিপাদ কেরলে মাল্লাপুরম নামে একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা পর্যন্ত গঠন করে দিয়েছিলেন।

এক সময় ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের কাছাকাছি আসার লড়াইয়ে ফুরফুরা শরিফের দুই মুসলমান ধর্মগুরুর লড়াইয়ে ত্বহা সিদ্দিকি যতটা গুরুত্ব পেয়েছিলেন আব্বাস সিদ্দিকি ততটা পাননি। সে জন্যই মমতাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আব্বাস সিদ্দিকি বিরোধীদের সঙ্গে জোট বেধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই লড়াইয়ের জন্য আব্বাসের প্রয়োজন ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষতার পোশাক। দেশভাগের নায়ক জিন্নার মুসলিম লিগকে যেমন তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস মিলে ধর্মনিরপেক্ষতার পোশাক সরবরাহ করেছিল ঠিক তেমনি স্বাধীনতার সাতদশক পরে জিন্নারই উত্তরসূরি আব্বাস সিদ্দিকি ও আসাদুদ্দিন ওয়াসির কট্টর সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে (ইন্ডিয়াস সেকুলার ফ্রন্ট, মসলিসে-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনরা, এমআইএম)-কে বামদলগুলি ও কংগ্রেস মিলে ধর্মনিরপেক্ষতার পোশাক সরবরাহ করছে।

২৮ ফেব্রুয়ারির ব্রিগেড ছিল আব্বাসের গায়ে সেই পোশাক পরানোর আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

মুসলমান তোষণের সব সীমা লঙ্ঘন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইমামভাতা দিচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজে হিজাব পরে ঘুরছেন, জয়শ্রীরাম ধ্বনি দিলে গ্রেপ্তার করাচ্ছে, মুসলমান পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর পেলেই স্কলারশিপের ব্যবস্থা, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসার জন্য রেকর্ড পরিমাণ বরাদ্দ, উত্তরবঙ্গের মুসলমানদের জন্য নস্যশেখ উন্নয়ন পর্ষদ গড়ার মতো বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই হিন্দু জনমানসে ব্যাপক রোষের সৃষ্টি করেছে। নিজেকে হিন্দু প্রমাণ করার জন্য দিনের বেলা বিভিন্ন মন্ত্রের ভুল ও বিকৃত উচ্চারণ করছেন। আবার রাত হলেই চলে যাচ্ছেন মুসলমান এলাকায় 'মোনাজাত' করার জন্য। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যদি কোনো কারণে ত্রিশঙ্কু ফলাফল হয় তবে বিজেপিকে ঠেকানোর নামে সমস্ত অবিজেপি দলগুলি যে একমঞ্চে এসে সরকার গঠনের প্রয়াস করবে এবং আব্বাস সিদ্দিকির মতো মোল্লারাই যে কিং মেকার হয়ে উঠবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে হিন্দুরা আরও কোণঠাসা হবে, পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাঙ্গলাদেশ হওয়ার পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে। সেজন্য ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচন আসলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। □

প্রার্থী বাছাই নিয়ে দলীয় কোন্দলকে গুরুত্ব দিলে চলবে না

বিশ্বপ্রিয় দাস

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষ করে শাসক দল বা বিরোধী দল, সে যে দলই হোক না কেন, এবারের নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই করতে গিয়ে একটু যে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বা হয়েছে, সেটা চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়। আর তার প্রতিফলন দেখা গেছে দলীয় দপ্তর বা স্থানীয় ভাবে সামান্য হলেও সমর্থকদের প্রতিবাদের একটা ঢেউ আছড়ে পড়েছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার জন্য। কতটা তাঁরা সফল আর কতটা সফল নয়, সেই প্রশ্ন না হয় তোলা থাক ভবিষ্যতের জন্য।

এবারের নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দল পরিবর্তনের একটা ওয়েভ তৈরি হয়েছে। এর কারণ আর কিছুই নয়, আগের ৩৪ বছরের বাম শাসন ও পরবর্তী ১০ বছরের তৃণমূল সরকারের অপশাসন। এই দুয়ে মিলে রাজ্যকে ঠেলে দিয়েছে প্রায় ১৩২ বছর পিছনে। ২০২১-এর নির্বাচনে মানুষের মনে একটু হলেও একটা পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে। বিরোধী দলগুলি সেই ইচ্ছাকে মান্যতা দিয়ে, নিজেদের মতো করে ঘুঁটি সাজিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছে। আর এই লড়াইয়ের ময়দানে যে খেলা হবে, যে যত বুদ্ধি দিয়ে চাল দেবে কিস্তিমাত করবে তারাই। তবে অ্যাডভান্টেজ অবশ্যই শাসক বিরোধী দল।

ফিরে আসা যাক আগের কথায়। রাজ্যে এখন সাধারণ মানুষ ভরসা দেখতে পাচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ওপর। এর কারণ আর কিছুই নয়, তাঁরা ইতিমধ্যেই বামেদের দেখে ফেলেছে, দেখে ফেলল তৃণমূল সরকারকেও। ফলে তাঁদের হাতে এই মুহূর্তে একমাত্র সরকার পরিবর্তনে বিকল্প হচ্ছে সর্বভারতীয় দল বিজেপি। এর পিছনে কাজ করছে, বিজেপির স্বচ্ছ ভাবমূর্তিও। রাজ্যের সাধারণ মানুষের মনের গহনে থাকা সেই ইচ্ছাকে মান্যতা দিতেই হবে।

সর্বভারতীয় একটি দল রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া আনছে। সেই দলের কাছে সাধারণ মানুষের না পাওয়ার যন্ত্রণাকে মূল্য দিয়ে এগোতে হবে। মনে রাখতে হবে, রাজ্যের সরকার গড়তে হবে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাজনৈতিক মানুষের কথা ভেবে নয়।

এবারে শুরু থেকেই বিজেপি তাঁর ঘর গোছাতে গিয়ে, শাসক দলের ঘরকে একেবারে নড়বড়ে করে দিয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দলবদলের বিষয়টা একেবারেই লড়াইয়ের ময়দানের একটা স্ট্র্যাটেজি। সেই স্ট্র্যাটেজিতে বিজেপি যে ১০০ শতাংশ সফল, সেটা বোঝাই গেছে। রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমো থেকে উচ্চতর নেতৃত্বের কপালে বারে বারে ভাঁজ ফেলে দিয়েছে ভোটের ময়দানে লড়াই করার পরিকল্পনা করতে। তাঁদের মধ্যে প্রার্থী বাছাই নিয়ে ভয়ংকর একটা দলীয় গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে। যারা টিকিট পাননি, সেই সব আগের বিজয়ী প্রার্থীদের অনেকেই দল ছেড়েছেন। আর শাসক দলের ভাবমূর্তি একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। আর ভিতরে ভিতরে ভোটের খেলায় সেই সব টিকিট প্রত্যাশীদের অনুগামীদের একটা স্যাবোতাজের বা অন্তর্ঘাতের একটা অংক কষা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। যেটা কোনো রাজনৈতিক দলের কাছেই প্রত্যাশিত নয়।

প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিজেপি যে স্বচ্ছতা দেখিয়েছে সেটা অবশ্যই বাহবা যোগ্য। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে বিজেপির অন্দরেও দুটি গোষ্ঠী ইতিমধ্যে মাথা চাড়া দিয়েছে। একটি নব্য, অন্যটি আদি। এই আদি ও নব্যদের লড়াই চাপা দিতে গিয়ে সামান্য হলেও দলীয় নেতৃত্বকে হ্যাপা পোয়াতে হচ্ছে। প্রার্থী বাছাই ও ঘোষণা হয়ে যাবার পর, কলকাতার দলীয় কার্যালয়ের সামনে

অনুগামীদের প্রার্থী না পসন্দের কারণে প্রতিবাদ জানাবার ভঙ্গি দেখে, বিজেপির প্রতি যে সাধারণ মানুষ বা ভোটারদের একটা অন্য ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা বলাই যায়। কেননা তাঁদের কাছে এই গোষ্ঠী কোন্দলের একটা বিবস্ত্র রূপ প্রকাশ পাচ্ছে, যেটা তাঁরা ভালো চোখে দেখছেন না।

এই গোষ্ঠী কোন্দল কিন্তু বিজেপির একেবারে ১০০ শতাংশ বলা যাবে না। তাঁর কারণ, হেস্টিংসের বিজেপি দলীয় দপ্তরের সামনে যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছিল, তার মধ্যে মিশে ছিল বিজেপি বিরোধী দলের সমর্থকরা। এটা নিশ্চয়ই বিজেপি নেতৃত্ব জানেন বা দেখেছেন। স্থানীয় ভাবে ওই প্রতিবাদী দলের মধ্যে মিশে গেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের লোকজন ও কিছু সংযুক্ত মোর্চার লোকজনও। যারা প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলেন, তাঁরা যদি সামান্য হলেও দলকে ভালোবাসেন, নেতৃত্ব যদি তাঁদের বোঝান যে দল যাকে ঠিক করেছে, সেই উপযুক্ত, আর সেই দলের মুখ, তাঁর জন্যই সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তাহলে বিজেপি বিরোধী দলগুলি বিজেপির ভাবমূর্তি নষ্ট কারর সুযোগ পেত না। যদি প্রার্থী না পসন্দ হয়, তাহলে একটি সংগঠিত দলের সদস্য হিসেবে, একটা মাস পিটিশন দিয়ে দলীয় নেতৃত্বের কাছে নিজেদের প্রতিবাদ জানানোই যেত। মনে রাখতে হবে, একটি বিধানসভা ক্ষেত্রে টিকিট প্রত্যাশী একাধিক থাকেন। হয়তো এমন দেখা গেছে যে দলের জন্য সর্বক্ষণের নিবেদিত প্রাণ, তিনি তাঁর কাজের মধ্যে দিয়েই টিকিট পাবার অধিকারী। সেই মানুষটি প্রার্থী হিসেবে অন্য এক উপযুক্তের নাম প্রস্তাব করছেন। আর দল তাঁর সেই ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে, মর্যাদা সহকারে তাঁর মনোনীত মানুষটিকে প্রার্থী হিসেবে পেশ করছে। এক্ষেত্রে যিনি প্রস্তাব করলেন, তাঁর অনুগামীরা ভাবলেন, তাঁকে বঞ্চিত করা হলো, মনে দুঃখ নিয়ে তাঁরা প্রতিবাদ করতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানতে পারেন না যে, দলের সর্বসম্মতভাবে ঠিক করা প্রার্থীর নাম ঘোষণা করার আগে, তাঁদের নেতার মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এবারে আসা যাক প্রার্থী বাছাই নিয়ে মনোমালিন্য কেন বাড়ল বিজেপিতে সেই কথায়। এখানে রাজনৈতিক মহলের একটি বিশিষ্ট সূত্র জানাচ্ছে, ২৯৪টা আসনে প্রার্থী বাছাই করতে প্রায় একমাস ধরে আলোচনা চলছে। একেবারে নীচু তলা থেকে দলীয় ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, কে উপযুক্ত আর কে নয়? সে ভাবেই একটা রূপরেখা রাজ্যস্তর থেকে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। প্রতিটি আসনের জন্য একাধিক নাম ছিল সেখানে। যে যে নামগুলি ছিল, কোনো কারণে সেই গোপনীয় বিষয়টি আর গোপন থাকেনি। ফলে যখন কেন্দ্রীয় ভাবে একটি নাম বাছা হয়েছে তখন অপরাপর প্রত্যাশীরা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন আর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। সেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে তাঁর অনুগামীদের প্রতিবাদ করতে বলেছেন। দেখা গেছে এরা অনেকেই নব্য। এই প্রার্থী নিয়ে যে গোষ্ঠী কোন্দলের চেহারা সামনে এল, সেটা কতটা ক্ষতি করতে পারে ভোটের ময়দানে? ১। রাজ্যে যাদের বিরুদ্ধে লড়াই, সেই তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের প্রচরে এই ভঙ্গুর ভাবমূর্তিকে প্রচারের হাতিয়ার করবে। ২। স্থানীয় ও জাতীয় নানা সংবাদমাধ্যমে এই প্রতিবাদের যে সংবাদ ও চিত্র প্রকাশিত হবে, সেই রাজনৈতিক ক্ষতকে এই ভোটের মুহূর্তে মেরামত করা খুব একটা সহজ হবে না। ৩। সাধারণ মনুষ যে দলটাকে ভরসা করে পরিবর্তন আনতে চাইছেন, সেই দলটার মধ্যেকার অন্তর্কলহের বিষয়টা তঁদের চিন্তা ও ভাবনার স্তরে সামান্য হলেও নাড়া দেবে। সেটা খুব একটা সুখকর হবে না বিজেপির কাছে মনে রাখতে হবে রাজ্যের শাসক দল, মূল লড়াই যাদের বিরুদ্ধে, তাঁরা শেষ অস্ত্র হিসেবে এই দলীয় কোন্দলটাকে প্রচরের সব মাধ্যমেই ব্যবহার করবে। এখানে আরও একটি বিষয়কে মাথায় রাখতে হবে, রাজ্যে বিজেপি একা, তাঁদের বিরুদ্ধে শাসক দলের জোট ও বাম-কংগ্রেস-আইএসএফের জোট। ফলে খুব ঠাণ্ডা মাথায় এই খেলায় ডিফেন্স করে এগোতে হবে। ৪। ইতিমধ্যেই বিজেপির মধ্যে বিভিন্ন দল থেকে বহু মানুষ এসেছেন। সবাই যে দলকে ভালোবাসবে, এটা ভাবা ভুল হবে উচ্চতর নেতৃত্বের কাছে। এই সর্ষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভূত। যারা সঠিক সময়ে, নখ ও দাঁতের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে দলকে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি এখন থেকেই দিতে হবে। চিহ্নিত করতে হবে তাঁদের। তাদেরকে বুঝতে না দিয়ে, সব কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে এগোলে ফল পাওয়া যাবে হাতে হাতে।

সব শেষে কয়েকটি কথা বলা যাক। সর্বভারতীয় একটি দল রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া আনছে। সেই দলের কাছে সাধারণ মানুষের না পাওয়ার যন্ত্রণাকে মূল্য দিয়ে এগোতে হবে। মনে রাখতে হবে, রাজ্যের সরকার গড়তে হবে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাজনৈতিক মানুষের কথা ভেবে নয়।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

পাকা ফসল ঘরে তোলার সময় আবেগের জটিলতা কাঙ্ক্ষিত নয়

পশ্চিমবঙ্গের জমিতে ধান পেকেছে বিজেপির। কিন্তু পোকা তাড়ানোর ওষুধ না দিলে পাকা ধান ঝরে পড়বে।

সুকল্প চৌধুরী

এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার আগেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্য বিধানসভার প্রথম দফার ভোট। রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার তুঙ্গে, ফেস্টুন, ব্যানার, দেওয়াল লিখন, রাজনৈতিক সভা, ভোটদাতাদের ঘরে ঘরে যাচ্ছেন প্রার্থীরা— এমনটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম দফা ভোটের মুখে এসেও সকলেরই নজরে পড়ছে কয়েকটি বাংলা সংবাদপত্র বা বাংলা সংবাদ চ্যানেলের দিকে। যারা নিয়মিত বিজেপির প্রার্থী নিয়ে দলীয় কর্মীদের ক্ষোভের কথা প্রকাশ করেই চলেছে। তাদের কাছে হুইল চেয়ারে বসা পায়ে প্লাস্টার করা তৃণমূল নেত্রীর পা আর বিজেপির প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ ছাড়া আর কিছুতেই গুরুত্ব নেই।

মানতেই হবে বিজেপির প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরে দলীয় কর্মীদের মনে কিছুটা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। গত ১৬ মার্চ পরবর্তী তালিকা প্রকাশিত হতেই অনেক জায়গাতেই কিছু বিজেপি কর্মী পথে নেমে বিক্ষোভ দেখান। দ্বিতীয় দফায় ৭৫টি আসনের ভেতর ৬৪টি আসনের জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে বিজেপির নির্বাচন কমিটি। এই দিনই সিঙ্গুর-সহ কয়েকটি কেন্দ্রের প্রার্থীদের নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ দেখান দলীয় কর্মীদের একটি অংশ। পরের দিন বিজেপির হেস্টিংস দপ্তরের সামনে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পাঁচলা, উদয়নারায়ণপুর ও রায়দিঘি এলাকার কর্মীরা। গত মঙ্গলবার বাগনান, উদয়নারায়ণপুর, গোঘাট, খানাকুল, সিঙ্গুর, ডায়মন্ডহারবার, কুলপি, সাতগাছিয়া, সোনারপুর দক্ষিণ, জয়নগর, কুলতলি, মন্দিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ের সামনে জমায়েত করেন। এই বিক্ষুব্ধ কর্মীদের বক্তব্য ছিল তৃণমূল কংগ্রেস থাকার সময় বিজেপি কর্মীদের উপর হিংসাত্মক আক্রমণ যারা করেছে রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের সেই নেতারা দল বদল করেই বিজেপির টিকিট পেয়েছে। বিজেপির ক্ষুব্ধ কর্মীদের দাবি নিজেদের স্বার্থে এইসব তৃণমূল নেতারা দল বদল করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, যারা দীর্ঘদিন বিজেপির সংগঠনকে মজবুত করেছেন তাঁরা বঞ্চিত।

কোনও সন্দেহ নেই দীর্ঘদিন ধরে অগণিত বিজেপি কর্মী-সমর্থক দলীয় নীতি আদর্শকে আঁকড়ে ধরে সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। কোনও কিছু পাওয়ার আশা না করে দিন রাত মানুষের পাশে থেকেছেন। সংগঠনকে মজবুত করতে নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন। বেশিরভাগ দলীয় কার্যকর্তা মনে করেন বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হওয়া মানে আখের গুছানো নয়। উপরন্তু সব ধরনের ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। বিজেপি মানে দেশের সেবক। দেশ সেবার মনোভাব না থাকলে বিজেপির প্রকৃত কার্যকর্তা হওয়া যায় না। সমস্ত ক্ষেত্রে বিজেপিকে সামনে রেখে দেশ এগিয়ে চলেছে কার্যকর্তাদের অতুলনীয় ত্যাগের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গের চলতি বিধানসভা নির্বাচনে কয়েকটি জায়গায় বিজেপি প্রার্থীদের নিয়ে কিছু দলীয় কর্মীর উষ্মা সংগত বলেই নিরপেক্ষ রাজনৈতিক সাংবাদিকরা মনে করেন। তাঁর মনে করেন, বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের ক্ষমতাবান দেখতে ভালোবাসেন। অতীতে কংগ্রেস, পরে বামেরা, এখন তৃণমূল কংগ্রেসের উপর মহলের তো বটেই স্থানীয় স্তরের নেতারাও ক্ষমতার দম্ভে অন্য জগতের মানুষ হয়ে গেছেন। এর উপর বর্তমান রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের কাটমানি, কয়লা, বালি, গোরু-সহ বিভিন্ন পাচার সূত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা অল্প দিনের ভেতর আয়— এই সবই সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন বিজেপি কার্যকর্তারা একই মনোভাব পোষণ করেন এমনটা কখনই নয়। তৃণমূল থেকে আসা নেতারা ফের ক্ষমতার অলিন্দেই থেকে যাবে আর যারা সারাজীবন ত্যাগ করে গেল তাঁদের ভাড়ার শূন্য থেকে যাবে এমন ভাবনাও এই ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের নেই। এই ক্ষুব্ধ কর্মীরা মনে করেন তৃণমূলে যাঁরা টিকিট পাননি তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েই কেন টিকিট পাবেন? তৃণমূল ত্যাগী নেতাদের কী এমন গ্রহণযোগ্যতা আছে যে তাঁদের টিকিট দিতে হবে?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যারা বিজেপি কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁদের ক্ষোভের পেছনে আবেগ ও সংগত কারণ আছে কিন্তু যুক্তি কতটা আছে নিজেরাও সম্ভবত ভেবে দেখেননি। রাজনৈতিক

নেতারা জানেন মেঠো রাজনীতি আলাদা। অতীতে অপ্রতিরোধ্য বামেরা এবং এখন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতার জোরে ঘেঁটো ফুলদেরও প্রার্থী করে দিচ্ছে। সেই বিষয়টি আলাদা। বিশ্লেষকরা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাইছেন সিঙ্গুরের কথা। চিরকাল বাম বিরোধী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এলাকার বাসিন্দা, এলাকার শিক্ষক ও মানুষের পাশে থাকার সুবাদে সিঙ্গুর হরিপাল-সহ গোটা এলাকা হাতের তালুর মতো চেনেন। সকলেই জানেন টাটা সংস্থা বহু ফসলি সিঙ্গুরের কৃষি জমিতে তাদের প্রস্তাবিত গাড়ি কারখানা করতে চেয়ে সেই সময়কার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জনশ্রুতি, পার্টি ফান্ডে একশো কোটি টাকার বিনিময়ে এবং রাজ্যের শীর্ষ নেতাদের সন্তানদের নামে টাটা মোটরস-এর শেয়ার থাকবে— এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে জমি হস্তান্তর হয়। প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সব জানতেন। আক্ষরিক ভাবে একা টাটা ও রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করেছেন। তৃণমূল সরকার গঠনের পর তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সিঙ্গুরের কৃষিজমি রাজ্য সরকার ফেরত পেলে সিঙ্গুরের মাস্টারমশাই মুখ্যমন্ত্রীকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন বন্ধ্যা জমিতে সর্ষে না ছিটিয়ে শিল্প কারখানা গড়তে। সেক্ষেত্রে সিঙ্গুরে শিল্প হলেও নিজের রাজনৈতিক জমি হারাতেন মমতা। এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুরের জমিতে শিল্পের কথা বলছেন।

যাই হোক, সিঙ্গুরের বিজেপি প্রার্থী অনেক দিন থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী। প্রকাশ্যে তিনি মুখও খুলেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করে বিজেপি কি ভুল করেছে? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে সিঙ্গুরের বিজেপি প্রার্থী এবারে মাস্টার স্ট্রোক। সেখানে এখন ইচ্ছুক অনিচ্ছুক ভেদাভেদ নেই। এই প্রজন্ম দু'টাকা কিলো দরে চাল ভিক্ষা চায় না। তাঁরা কর্ম সংস্থান চায়। ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে সেখানে শিল্প হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ভাবছেন, বিজেপির একটা অংশ যারা পথে নেমে দলকে একটা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছেন তাঁরা প্রার্থীদের যোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কখনও ভেবেছেন? আবেগ নয় যুক্তি দিয়ে ভেবেছেন কি? বিক্ষোভকারীরা অনেক বিকল্প নামের কথা বলেছেন। তাঁরাও চান না। কিন্তু দল তো তাঁদের অন্য কাজে লাগাতে চায়। একবার ভেবে নিতে হয় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, পৌর নিগম, বিভিন্ন সরকারি কমিটি, সমিতির সদস্য সংখ্যা কত।

খুব সাম্প্রতিক সময়ে সাংবাদিক বৈঠক শেষে কয়েকজন হাতে গোনা সাংবাদিক ও দলের রাজ্য স্তরের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে ঘরোয়া চা চক্রের আলোচনায় বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেছিলেন, রাজ্যের তো বটেই দেশের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ক্ষমতায় আসা দরকার। যে ভাবে অনুপ্রবেশ, পাচার বাড়ছে এবং সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠছে পশ্চিমবঙ্গ তাতে ভবিষ্যৎ খুব ভয়াবহ। এ রাজ্যের জামাই নাড্ডাজী মনে করেন তাঁকে যতই হাড্ডা ফাড্ডা চাড্ডা বলা হোক তিনি হিংসা কবলিত পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে চিন্তিত। এই প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার অনুপ্রবেশ অনেকটাই বন্ধ করেছে। কিন্তু ভয়মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা, হিংসা বন্ধ করা, ব্যাপক কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হওয়া, শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সবই রাজ্য সরকারের কাজ। পাশাপাশি বহিরাগত তত্ত্ব না আউড়ে এই রাজ্যও ভারতের অংশ— এই ভাবনাতে শামিল হতে হবে। তাই বিজেপি এমন প্রার্থীদের মনোনয়ন দেবে যারা নিজেদের নিয়ে নয় রাজ্য নিয়ে ভাববে। রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করবে।

যারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে রোজ এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে থাকতে চাইছেন তাঁরাও একবার তাঁদের দলের সর্বোচ্চ নেতার কথা ভাবতে পারেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ক্ষুব্ধ বিজেপি কার্যকর্তা-সমর্থকদের আবেগ ও ভাবনাকে সম্মান জানিয়ে আরও একটি প্রসঙ্গ তুলেছেন। এই বিশ্লেষকরা বলতে চাইছেন পথে নামা বিজেপি কর্মীদের ভেতর কোনও বেনোজল আসেনি তো? তাঁরা তো প্রথমেই বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি আলোচনার দাবি তুলতে পারতেন। রাজ্য স্তরের পরিচিত নেতা অভিজিৎ দাসের দিকে কে পাথর ছুড়ে মারল? কেন পুলিশের দিকে ঢিল গেল? বিনা কারণে পুলিশকে লাঠি চালাতে প্ররোচিত করা হলো কেন? যাদের ধরা হয়েছে তাঁরা কি প্রকৃত দোষী? এইসব প্রশ্নও কিন্তু আসছে।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের সহ-সম্পাদক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ইত্তেহাদুল রহমান মিলন জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের জমিতে ধান পেকেছে বিজেপির। কিন্তু পোকা তাড়ানোর ওষুধ না দিলে পাকা ধান ঝরে পড়বে। উল্লেখ্য, গোটা বিশ্বের একমাত্র রাজনৈতিক সাংবাদিক মিলন গত লোকসভা নির্বাচনের আগে কলকাতায় বলেছিলেন বিজেপি একাই তিনশোর বেশি আসন পারে। সেদিন হেসেছিল কলকাতা প্রেস ক্লাব।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

রামমন্দির নিধি সংগ্রহে চুয়াল্লিশ দিনে একুশশো কোটি

দুর্গাপদ ঘোষ

অযোধ্যায় বহু প্রতিক্ষিত রামজন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত গোটা পরিসর চত্বরে ৪০ ফুট গভীর করে মাটি কাটার কাজ শেষ হয়েছে। সেখানকার জমা জল সরিয়ে গত ১৪ মার্চ থেকে চালু হয়েছে ভিতের গাইনিং বা স্তরে স্তরে নির্মাণের কাজ। মন্দিরের ভিতে কিংবা গোটা কাঠামোয় কোনো লোহা কিংবা সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে না। একথা প্রথম থেকেই জানিয়ে আসছেন প্রধান স্থপতি চন্দ্রকান্ত সোমপুরা, যিনি এর আগে সোমনাথ মন্দিরের প্রধান স্থপতি ছিলেন। তবে এই প্রতিবেদনের মূল আলোচ্য বিষয় হলো এর জন্য অর্থ সংগ্রহ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অভিধায় 'শ্রীরামজন্মভূমি নিধি সমর্পণ অভিযান।' তাতে মানুষের রামভক্তির সে আবেগ দেখতে পাওয়া গেছে তা বোধহয় পরিষদের নেতারও প্রথমে অনুমান করতে পারেননি। কেবল ভারতবর্ষই নয়, ভারতের ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে প্রায় গোটা বিশ্বে যেভাবে সাড়া মিলেছে তাকে এক কথায় রামভক্তির সুনামি বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শ্রী চম্পত রাই জানিয়েছেন যে সারা ভারতে প্রায় ৮ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবী এই নিধি সংগ্রহ অভিযানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গত ১৫ জানুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাত্র ৪৪ দিনের মধ্যে ২ হাজার ১ শো বা একুশশো কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ-সহ সমগ্র ভারত এবং সারা বিশ্বে ওই সময় একটা অতি আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই নিধিসমর্পণ অভিযান। ঠিক কী কারণে, কীসের টানে এবং কেন ও কীভাবে সমাজের সর্বস্তরের এত লক্ষ মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা এমনকী গবেষণাও।

কলকাতার ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম)-এর একদল গবেষক এজন্য গত ২৩ ফেব্রুয়ারি অযোধ্যায় গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁদের গবেষণার নিষ্কর্ষ এখনো প্রকাশ পায়নি বটে কিন্তু নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা যাচ্ছে যে কেবল সংগৃহীত অর্থ ঠিকমতো ব্যাঙ্কে-ব্যাঙ্কে জমা করার জন্যই প্রায় ৩৮ হাজার জনকে নিযুক্ত করতে হয়েছিল একথা জেনে গবেষকরা রীতিমতো বিস্মিত হয়ে গেছেন। চম্পত রাই আরও জানিয়েছেন, ন্যূনতম ১০ টাকা থেকে শুরু করে মোট ২০ কোটি কুপন প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু তার বাইরে বহু মানুষ ক্রস চেক এবং ডিম্যান্ডড্রাফ্টের মাধ্যমে অর্থ সমর্পণ করেছেন।

ইতিপূর্বে গুজরাট সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ এবং কন্যাকুমারিকায় স্বামী বিবেকানন্দ শিলা স্মারক মন্দির নির্মাণের সময়ও সর্বসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু

ভাঁড়ে জমানো টাকা থেকে নিধি সমর্পণ।

এবার রামজন্মভূমি মন্দিরের জন্য যে সাড়া মিলেছে তা অভূতপূর্ব। অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ায় রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টেরও শীর্ষনেতা শ্রী রাই গত ২৭ ফেব্রুয়ারিতেই ঘোষণা করেন যে এখন আর অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন নেই। সেইমতো পূর্ব নির্ধারিত দিনেই অভিযান বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ্য, গত ১৫ জানুয়ারি ট্রাস্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে এই অভিযান শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী মহামহিম রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। তিনি ৫ লক্ষ ১ টাকা প্রদান করেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ১৯৯০ সালের জানুয়ারি থেকে প্রথম পর্যায়ে একবার নিধি সংগ্রহ অভিযানে নেমেছিল। সেবার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ কোটি টাকা। সেবারও রামভক্তির ব্যাপক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। সংগৃহীত হয়েছিল প্রায় তার দ্বিগুণ, ৯ কোটি ৮৬ লক্ষেরও বেশি। তখন রামজন্মভূমি মুক্তি সংগ্রামের প্রাণপুরুষ তথা প্রধান সেনাপতি অশোক সিঙ্ঘল জীবিত ছিলেন। তাঁর নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে সেই অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। কারণ তখনও রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদ বিতর্কের অবসান ঘটেনি। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর রামভক্ত করসেবকদের রোষে ভারতে বিদেশি আক্রমণকারী মোগল বাদশাহ বাবরের নির্দেশে ধ্বংস হওয়া রামমন্দিরের বুকের ওপর তথাকথিত বাবরি ধাঁচার কলঙ্কচিহ্ন মজুত ছিল। কিন্তু অসামান্য দূরদ্রষ্টা সিঙ্ঘল জানতেন সে

নিধি সমর্পণে এগিয়ে এসেছেন মুসলমানেরাও।

হিন্দু সমাজ যেভাবে জেগে উঠছে তাতে একদিন না একদিন রামজন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মাণ হবেই হবে। সেই লক্ষ্যে ১৯৯০ সাল থেকেই শুরু হয় পাথর খোদাইয়ের কাজ। এজন্য রাজস্থানের ভরতপুর থেকে পাথর আনানো শুরু এবং তাতে নকশা খোদাইয়ের কাজ আরম্ভ করা হয় ব্যাঙ্কে জমানো সেই অর্থ থেকে। কুচক্রী রাজনৈতিক মতলববাজেরা 'দশ কোটি টাকা কোথায় গেল' বলে বার বার প্রশ্ন তুলে কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু পাথরের কারুকাজের খাঁজে-খাঁজে, কন্দরে-কন্দরে সেই অর্থের সন্ধান করার চোখ এবং মানসিকতা কোনোটাই তাঁদের ছিল না। তাঁরা ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে মুসলমান তুষ্টিকরণের মোহে অন্ধ হয়ে থেকেছেন। তারপর ১৯৯৩ সালে হঠাৎ করে প্রকাশ পায় যে অযোধ্যায় ১৯৯০ সালের ২ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিংহ যাদবের পূর্ব পরিকল্পিত বর্বরোচিত আক্রমণে নির্বিচারে নিহত করসেবকদের স্মৃতি রক্ষার্থে নামাঙ্কিত করসেবকপুরমে গড়ে উঠেছে রামজন্মভূমি ন্যাস কার্যশালা। সেখানে ১৯৯০ সাল থেকে নকশা কেটে কেটে জমিয়ে রাখা হচ্ছে প্রস্তাবিত মন্দিরের জন্য পাথরের স্তম্ভ এবং অন্যান্য স্ল্যাব।

এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে নিধি সংগ্রহ অভিযানের আগে মন্দিরের পরিকাঠামো এবং পরিসরের আয়তন বৃদ্ধি করার প্রেক্ষিতে খরচের পরিমাণ ধরা হয়েছিল আনুমানিক ১ হাজার ১০০ শো কোটি টাকা। সেই লক্ষ্যে সংগ্রহ অভিযানে নামে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, তাদের যুব শাখা বজরঙ্গ দল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, অন্যান্য কিছু হিন্দু সংগঠন। এই অভিযানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫০ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে যা ভক্তিভরে এবং স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সমর্পণ করেছেন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর মানুষ। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখতে পাওয়া গেছে তা কেবল ইতিপূর্বে করসেবার সময়কালের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বহু আইএএস, আইপিএস স্তরের আধিকারিক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক পদাধিকারীদের এগিয়ে আসাটাও উল্লেখ করার মতো। এগিয়ে এসেছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশও। বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা।

অযোধ্যার অবস্থান উত্তরপ্রদেশে। সেজন্য সেখানকার লোকেদের এগিয়ে আসাটা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। সাফল্যও এসেছে আশাতীত। রাজধানী লক্ষ্ণৌ-এ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ৪২ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। তার আগে এই অর্থ সংগ্রহ অভিযানের প্রথম তিন দিনের অর্থাৎ ১৭ জানুয়ারির মধ্যে সংগৃহীত হয় ৫ কোটি টাকা। এবং তা কেবলমাত্র কাশী প্রান্ত থেকে। পরিষদের এক নেতা তথা রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের অন্যতম প্রধান সদস্য ড. অনিল মিশ্র জানিয়েছেন যে নিধি সংগ্রহের প্রথম দিনেই দিল্লিসহ সারা দেশে ২ কোটি ২৫ লক্ষেরও বেশি টাকা ট্রাস্টের তহবিলে জমা পড়ে যায়। প্রয়াগরাজ (এলাহাবাদ) জেলায় নিধি সংগ্রহ অভিযানে নামে মোট ১৪২টি গ্রুপ। তাতে নেতৃত্ব দেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক শ্রী রমেশজী। প্রয়াগরাজ জেলার পিপল গাঁও নামের এক প্রত্যন্ত গ্রামে পণ্ডিত রামচন্দ্র মিশ্র মেমোরিয়াল স্কুলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রমেশজী পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের জন্মস্থানে সুরম্য মন্দির নির্মাণের জন্য ভক্তির অর্ঘ্য সমর্পণ করার আহ্বান জানানো মাত্রই ওই গ্রামের গ্রামপ্রধান ব্যক্তিগতভাবে এক লক্ষ এক হাজার একশো এক টাকা সমর্পণ করেন। নিধি সমর্পণ অভিযানের কাশী প্রান্তের প্রধান দিবাকর ত্রিপাঠীর কথায়, এই প্রান্তেই ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ স্বেচ্ছায় এই অভিযানে আত্মনিয়োগ করেন।

যেটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে তাহলো রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সে টাইটেল স্যুট (মামলা) চলেছিল সেই মামলায় যিনি অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন তিনি হলেন প্রয়াত হাসিম আনসারি। জীবিত থাকাকালেই রামমন্দিরের পক্ষ নিয়ে তিনি নিজেই মামলা প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ছেলে ইকবাল আনসারি শুধু যে তাঁর বাবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন তাই নয়, এবার এই নিধিসংগ্রহ অভিযানে তিনি অন্যদের সঙ্গে সক্রিয় ভূমিকাও নিয়েছেন। নিধি সংগ্রহকারীদের সঙ্গে থেকে অযোধ্যায় মুসলমানদের ঘরে ঘরে গেছেন। তাতে কেবল অযোধ্যাই নয়, ফৈজাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি এলাকার মুসলমানদের অনেকে সাড়াও দিয়েছেন, যা রামমন্দির বিরোধী এবং মার্কামারা বাবরিপন্থী উগ্র সেকুলারদের মুখের মতো জবাব বলা যেতে পারে। ইকবাল আনসারি তো মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজে একজন 'সাধারণ শ্রমিক' হিসেবে আত্মনিয়োগ করার আগ্রহও প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশ শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত রামজন্মভূমি মন্দিরের জন্য রুপোর তৈরি ১৪ খানা তির দান করা হয়েছে। যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, ১৪ বছর বনবাসের পর দুরাচারী রাবণ নিধনের প্রতীক। এছাড়া সিন্ধী সেবা সঙ্গম মন্দিরের জন্য ২০০ খানা রুপোর ইট দান করার কথা ঘোষণা করেছে।

গোরক্ষ পীঠের মঠাধীশ যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েই ঘোষণা করেছিলেন যে, অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মাণ হবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না। এখন বার বারই তিনি তদারকি করে যাচ্ছেন। গত ১৫ মার্চের মধ্যে নয় নয় করেও ২৩ বার অযোধ্যায় গেছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নিরলস ও ডাকাবুকো কার্যকর্তা হিসেবে পরিচিত রাই শ্রী আগেই জানিয়েছিলেন সে পরিষদের লক্ষ্য শুধু অর্থ সংগ্রহই নয়, ১৫ জানুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দেশের ৫ লক্ষ গ্রামে অন্ততপক্ষে ২২ কোটি হিন্দুর কাছে গিয়ে পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের জীবন চরিতের বার্তা পৌঁছে দেওয়াটাও তাঁদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে মাঠে নেমে তাঁরা যে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছেন, লক্ষ্যমাত্রার প্রায় দ্বিগুণ অর্থ সংগ্রহ থেকেই তা স্পষ্ট। তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দদেব গিরির বক্তব্য অনুসারে বেশ ভালো পরিমাণে অতিরিক্ত নিধি সংগৃহীত হওয়ায় পরিবর্তিত ৫ পর্যায়ের মন্দির নির্মাণ ছাড়াও মন্দির পরিসরের আয়তন ৭০ একর থেকে বাড়িয়ে ১০৭ একর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে নিকটবর্তী সরযূ নদীতট থেকে মন্দির পরিসর পর্যন্ত সবুজায়ন করারও যোজনা নেওয়া হয়েছে। ভগবান রামচন্দ্র যে মানুষের অন্তরাত্মার আসনে অধিষ্ঠিত আবারও একবার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছে এই নিধি সংগ্রহ অভিযনে। □

ভূতেরা ঠেলাও মারে!

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'ঠিক দুপ্‌পর বেলা ভূতে মারে ঢেলা'।

সারাজীবন রবীন্দ্রচর্চা করে, কমপক্ষে গোটা পনেরো বই লিখেও বুঝতে পারিনি রবীন্দ্রনাথ এমনটা লিখেছেন কেন?

ভূতেদের তো রাত্রিবেলাতেই ঢেলা মারার অভ্যাস, দিনে-দুপুরে ঢেলা মারবার কথা তো শুনি না।

২০২১ সালের মার্চ মাসে পৌঁছে বুঝেছি, সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ পড়েও তাঁকে আদৌ বুঝিনি। রবীন্দ্রনাথ দূরদ্রষ্টা, ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা— এ বোধটুকুই এখনো হয়নি।

বুঝেছি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভয় পাওয়াতে চাননি বলেই রেখে ঢেকে কম করে বলেছেন। ভূতেরা দিনে-দুপুরে শুধু ঢেলাই মারে না, ঠেলাও মারে। আর সেই ঠেলাতেই না আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চোট পেলেন। যেমন তেমন চোট নয়— দশ কিলোমিটারের দূরত্বে থাকা নিজের তৈরি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, যার জন্য তিনি ঠিক আগের দিনই জনসভায় গর্ব করলেন, সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু না করিয়ে তাঁকে গ্রিন করিডোর দিয়ে নিয়ে আসা হলো কলকাতার চেনা হাসপাতালে— যেখানে সবাই চেনা— ডাক্তার-নার্স, মায় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীও। এঁদের তো পুরোটাই ভরসা করা যায়— ভরসা না থাকলে কি চিকিৎসা হয়?

আমাদের সকলের প্রার্থনায় মুখ্যমন্ত্রী খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং হুইল চেয়ারে বসে রাজ্যজুড়ে নির্বাচনী বক্তৃতা করবেন— আর আবেগের বন্যায় ভেসে যাওয়া বাঙ্গালি 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়' ধ্বনির অনুকরণেই নির্ঘোষ তুলবেন 'নন্দীগ্রাম ভেসে গেল, বাঙ্গলা ডুবু ডুবু।'

কথায় কথায় আসল কথা কি ভুলে গেলাম? কক্ষনো না, মুখ্যমন্ত্রীর চোটের কথা কি ভোলা যায়?

তবে জনান্তিকে আমারই মতো মুখ্যমন্ত্রীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানাই, আক্ষেপের কোনো কারণ নেই, বর্ষণের তুলনায় গর্জন তো বেশ ভালোই হয়েছে। বর্ষণ যেটুকু হয়েছে তা তো 'জয় মা' বলে নির্বাচনের তরণী ভাসিয়ে দেবার জন্যও যথেষ্টই।

আর চোটের কথা যদি তোলা হয় তাহলে লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে তো স্বীকার করতেই হয়, ভূতেরা তো আসল চোট দিয়েছে শুভেন্দুকেই। বাছাধন কীভাবে সামলায়, দেখাই যাক না। যে প্রতিপক্ষকে দেখা যায়, ভূমিপুত্র শুভেন্দু হয়তো তাকে সামলে নিতে পারতেন। কিন্তু শুভেন্দু তো প্রতিপক্ষকে দেখতেই পাবেন না। মেঘনাদের মতো বাণ ছুঁড়বে তারা আড়াল থেকে। পহেলা নম্বর শত্রু রামকে রাবণের ছেলে তো ছেড়ে দেয়নি।

মুখ্যমন্ত্রীর চারপাশে ঘিরে থাকা চার হাজার পুলিশের আট হাজার চোখে যারা ধুলো দিয়ে পালালো, সেই তেঁনাদের মনের খবর শুভেন্দু জানেন কিনা জানা নেই। কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারছেন শুভেন্দুর প্রতি সেই তেঁনাদের রাগের আসল কারণ।

সারদিন 'রাম' নাম করবে, ভূতেরা তোমাকে ছেড়ে দেবে?

আজন্ম জেনে এসেছি ওই শব্দটির প্রতি ভূতেদের জাতক্রোধ।

তাও শুধুমাত্র নন্দীগ্রাম থেকে ভূত তাড়ানোর চেষ্টা হলেও না হয় একটা কথা ছিল। তা নয়, পশ্চিমবঙ্গ থেকেই ভূত তাড়ানোর লক্ষ্যে দিন-রাত এক করে শুভেন্দু যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন, তাতে উচ্ছেদ ভয়ে ভীত ভূতেরা মরণ কামড় দেবে না তো কী!

শুভেন্দুর জেনে রাখা উচিত একরাজ্য ভূত তাড়ানো সহজ কথা নয়। আর দেশশুদ্ধ মানুষ 'রাম' শরণ নিলে কী হবে তা জানেন শুধুমাত্র 'রাম'।

সংযোজন : একটা ভুল রয়ে গেছে। ভূত বিশেষজ্ঞরা বলেন, হিন্দু মরলে ব্রহ্মদৈত্য, গেছো ইত্যাদি ভূত হয় এবং মুসলমান মরলে হয় মামদো ভূত।

রাম নামে হিন্দু ভূত হয়তো ভয় পাবে, কিন্তু মামদো ভূত?

এ-ভূতের নিদান না পেলে কী হবে তা কে জানেন?

—অমিত দাশ,
নিউগড়িয়া সমবায় আবাসন,
কলকাতা-৯৪।

যোগ্য জবাব দিতে হবে

কমেডিয়ান কাঞ্চন মল্লিকের তৃণমূলে যোগদান এবং বিধায়কের জন্য প্রার্থীপদ লাভ করেন। কয়েকদিন পূর্বে একদল অভিনেতা- অভিনেত্রী তৃণমূল দলে যোগদান করে এবং প্রায় সকলকেই এই নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করে। দলে যে কেউই যোগ দিতে পারে, রাজনীতির মাধ্যমে জনসেবা করার হক সকলেরই আছে। কিন্তু দলে যোগ দেওয়া মাত্রই তাকে প্রার্থী করা কতটা যুক্তিসঙ্গত। তাহলে ধরে নিতে হয় দলে প্রহণযোগ্য নেতা বা কর্মীর অভাব?

দলের ভাবমূর্তি ক্রমহ্রাসমান! কিন্তু ক্ষীয়মান বামপন্থীরা এ বিষয়ে খুবই সচেতন। এমনকী ভারতীয় জনতা পার্টিও এবিষয়ে সতর্ক। কিন্তু শাসকদলের কোনো দায়িত্ব সচেতনতা নেই।

আমার প্রশ্ন, কাঞ্চনবাবুর দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কিছু মাত্র কি পরিচিতি রয়েছে। উনি কোনো জনসেবামূলক কাজের সঙ্গে কি যুক্ত? শুধুমাত্র কমেডিয়ান অভিনেতা রূপে দর্শকমহলে যেটুকু পরিচিতি। এরকম একজন ব্যক্তি বিধানসভায় গিয়ে কী করবেন। হাস্যরস ও কৌতুক করে বিধানসভা মাতাবেন?

বিধানসভা ও সরকার চালিত হয় জনগণের অর্থে ও স্বার্থে। তাই এই ধরনের হঠকারিতা ও রসিকতা কোনো দল বা ব্যক্তির শোভা পায় না। তাই জনসাধারণের আশু কর্তব্য ভোটদানে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া। ভোটারদের এর যোগ্য জবাব দিতে হবে।

—সঞ্জয় দত্ত,
নবাবপুর, হুগলি।

ভণ্ড সেকুলার আব্বাস সিদ্দিকি

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আঙিনায় একটি নতুন দলের আবির্ভাব ঘটলো। যার প্রোপাইটার (হ্যাঁ, এক্ষেত্রে আমি 'প্রোপাইটার' শব্দটি ব্যবহার করলাম। কারণ ইনিই দলের সব।) আব্বাস সিদ্দিকি। যিনি নিজেকে পিরজাদা বলে অভিহিত করেন, কিন্তু পির নন। অর্থাৎ উনি পিরের ব্যাটা। ওনার নির্মিত নতুন দলের নাম আইএসএফ বা ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আব্বাস সিদ্দিকির দল কতটা সেকুলার? এরাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন। মুখে অবশ্য বলছেন--- দলিত, জনজাতি ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থে তার এই দল তৈরি করা ও ভোটে লড়াই করা। এই প্রসঙ্গে উনি সমালোচনা করেছেন বিজেপি-সহ তৃণমূল কংগ্রেসকে।

এক সময় এই আব্বাস সিদ্দিকি-ই চরম হিন্দু বিরোধিতা করেছেন। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর মৃত্যু কামনা করেছেন আর তিনিই এখন নতুন রাজনৈতিক দল খুলে নিজেকে সেকুলার প্রমাণ করতে চাইছেন। এটা দ্বিচারিতা আর ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু সবচেয়ে অবাক ব্যাপার, কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট কী করে এই 'ছদ্মবেশী সেকুলারের 'সঙ্গে আঁতাত করল?

সাধারণ মানুষ কিন্তু বিষয়টা ভালো চোখে দেখছেন না। ওই অশুভ আঁতাতের পতন যে অবশ্যম্ভাবী তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ঠিক সময়ে বুঝিয়ে দেবেন।

—নরেশ মল্লিক,
পূর্বস্থলী-২, পূর্ব বর্ধমান।

বাঁকুড়ার মানুষ ব্যঙ্গবিদ্রূপের পাত্র নন

আমরা ছেলেবেলায় শুনেছিলাম intellect শব্দের অর্থ বুদ্ধিমত্তা, সেখান থেকে intellectual অর্থাৎ বুদ্ধিশীলব্যক্তি। এখন intellect শব্দের বাংলা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'আঁতেল'। যখন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হিসেবে মানুষজনকে ত্যাগবতী জীবনচর্চার কথা বলতাম তখন যারা ভদ্রলোক (!) তাঁরা বলতেন সঙ্ঘ একটা আঁতেলেক্টুয়াল গোষ্ঠী, এরা বড়ো বড়ো কথা বলে— ত্যাগী তাঁরাই যারা জগতে সুনাম চায় এবং তার অন্তরালে নানারকম দুষ্কর্ম দ্বারা অর্থ রোজগার করে। কলকাতা ওরিয়েন্টেড ব্যক্তিরা বাঁকুড়ার ব্যক্তিদের বলতেন 'গাঁইপু', করণ এরা অতিরিক্ত মুড়ি খান জলের সঙ্গে মিশিয়ে। এখানে কোনোরূপ আঁতেলেক্টুয়াল ব্যক্তি নেই— কারণ সোকলড্ কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। তাই বারে বারে এখানে ভোটের সময় কলকাতা কেন্দ্রিক ব্যক্তিদের এখানে পাঠানো হয়। এখানে একসময় কাশীনাথ মিশ্র নামে এক ব্যক্তির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নাম শুনা যেত। তাই কখনো মুনমুন সেন, সুব্রত ব্যানার্জি, সায়ন্তিকা— যদিও এবার এখন তৃণমূলের টিকিট না পাওয়া একজন 'বহিরাগত' বলে চিৎকার করছেন কিন্তু তাঁর মনের কোনায় ছিল এমএলএ হবার ইচ্ছা। তবু ইনি দিদির অনুগত হিসেবে এই সমস্ত মেনে নেবেন। তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকছেন— বহু পুরানো— বিজেপি প্রার্থী কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই, তাঁকে সেইরকম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বলা যায় না। কিন্তু 'হাওয়া' বলে একটা জিনিস আছে, মোদীর হাওয়ার প্রভাব কাজ করবে--- এটাই তাঁর ভরসা। কলকাতা কেন্দ্রিক মমতার এটা জানা উচিত ছিল— বাঁকুড়ার মানুষ বোকা নয়, অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে--- ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্র বাঁকুড়ার ব্যক্তিরা নন আর সো কলড্ আঁতেলক্টুয়ালও নয়। পুরানো ব্যক্তিরা জানেন, জয়প্রকাশ নারায়ণের সময় কীভাবে এই মমতাদিদি তাঁর গাড়ির বনেটে নৃত্য করেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নরুচির কথাবার্তা দিন দিন প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। আর নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়ায় তা ভাইরালও হচ্ছে। এক সময়কার তাঁর একান্ত অনুগত শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারা তিনি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

—দীপক খাঁ,
পাটপুর, বাঁকুড়া।

কী মনে হতে পারে?

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু তার আগেই ভারত ভাগ করে ভারতের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান গঠন করা হয়েছিল। তখন কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দেশভাগের বিরোধিতা করে বলেছিলেন দেশভাগ হলে তা হবে তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে। কিন্তু মুসলিম লিগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার দাবির কাছে নতি স্বীকার করে তিনি দেশভাগ মেনে নিয়েছিলেন। মহম্মদ আলি জিন্নাকে তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভারত স্বাধীন হলে তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রী হোন আর নিজের পছন্দের লোক নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করুন।

মহম্মদ আলি জিন্না চেয়েছিলেন একটি স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান করে নিতে। তাই তিনি গান্ধীজীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলো কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ধর্মের ভিত্তিতে লোক বিনিময় হলো না। ধর্মের ভিত্তিতে লোক বিনিময় গান্ধীজী চিন্তাও করতে পারেননি। কিন্তু কেন? ধর্মের ভিত্তিতে যখন দেশভাগ হলো তখন ধর্মের ভিত্তিতে লোক বিনিময় হবে এটাই তো স্বাভাবিক। তাহলে? আমার বিশ্বাস গান্ধীজী চেয়েছিলেন সমগ্র ভারতকে ইসলামিক দেশে পরিণত করতে। কারণ খিলাফত আন্দোলন, মোপলা বিদ্রোহ প্রভৃতিতে তাঁর মুসলমান প্রীতি লক্ষণীয়। আবার নোয়াখালিতে অত্যাচারিত, নির্যাতিত এবং অসংখ্য ধর্ষিতা, অপহৃতা হিন্দুনারীর অবস্থা দেখেশুনেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটাও কথা না বলা এবং বিহারে অত্যাচারিত নির্যাতিত মুসলমানদের দুঃখে বিচলিত হওয়া এত সব কিছুতে কী মনে হতে পারে?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার
চন্দননগর।

খেতিবাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে সীমান্তরক্ষীর ভূমিকায় জ্যোতি

সুতপা বসাক ভড়

চেনাব নদীর তীরে অবস্থিত অখনুরের ছোট্ট একটি গ্রাম সংগানী। কুসংস্কারে জর্জরিত অধিকাংশ গ্রামবাসী। কিছু সময় আগে পর্যন্ত বাড়ির মহিলাদের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। কেবলমাত্র ঘর-সংসারের কাজেই তাঁদের জীবন কাটাতে হতো। চাকরি করা তো অনেক দূরের ব্যাপার, মেয়েরা সাইকেল চালাতেও ইতস্তত করত। এই পরিস্থিতিতে জ্যোতি ট্রাক্টর চালিয়ে সংসার সামলেছে। বর্তমানে বন্দুক হাতে নিয়ে দেশের সীমানা রক্ষা করছে।

জ্যোতি জম্মুর ওই অঞ্চলের পরিবর্তনের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়েছে। তাঁর উদ্যম দেখে অন্য মেয়েরাও উৎসাহিত হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে এবং এই পরিবর্তনে সমাজ আজ তাঁর সঙ্গে রয়েছে। জ্যোতি বর্তমানে কেবলমাত্র অখনুরের নয়, ওই অঞ্চলের বিস্তৃত ক্ষেত্রের মানুষের 'জ্যোতি' হয়ে উঠেছে।

অখনুরের ছোট্ট একটি গ্রাম সংগানীতে জন্ম জ্যোতি দেবীর। ছয় বোনের মধ্যে সে পঞ্চম, কিন্তু তার উদ্যম এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্য সে আজ ওই অঞ্চলের প্রথম মহিলা যার নামে ট্র্যাক্টর চালাবার লাইসেন্স আছে। বাবার ওপর সমগ্র পরিবারের দায়িত্ব ছিল এবং দিনে দিনে সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে উঠছিল। জ্যোতি জমিতে ট্র্যাক্টর চালিয়ে বাবাকে সাহায্য করে এবং পরিবারে সচ্ছলতা আনে। জ্যোতির বাবা সোবারাম কৃষিকাজ করার সঙ্গে সঙ্গে শাটারিংঙের কাজও করেন। প্রথমে জ্যোতি কৃষিকাজে বাবাকে সহায়তা করে। কয়েকবছর পূর্বে আরটিও কার্যালয় জম্মু থেকে ট্রাক্টর চালাবার লাইসেন্স পায়। সে জম্মু-কাশ্মীরের প্রথম মহিলা লাইসেন্স ধারক ট্রাক্টর চালক। কৃষিকাজ থেকে আরম্ভ করে ট্রাক্টর চালানো, এমনকী ট্রাক্টর চালিয়ে শাটারিংঙের জিনিসপত্র পৌঁছে দেবার কাজও করতে থাকে সে। প্রথম প্রথম গ্রামবাসীরা তাকে ট্রাক্টর চালাতে দেখে অবাক হতো। তারপর আপত্তিও জানাতে শুরু করে। তার বাবাকে পরামর্শ দিত, মেয়ে যাতে এইসব কাজ না করে। কিন্তু বাবা সোবারাম কোনো কথায় কান দেননি। তিনি মেয়েকে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। এরপর জ্যোতি আর থেমে থাকেনি। সে দেশ সেবার পথ বেছে নেয়। নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং অধ্যবসায়ের ফলে সে লিখিত এবং অন্যান্য পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বিএসএফ-এ ভর্তি হয়। তার বাবা সোবারাম জানান, যারা আগে জ্যোতির ব্যাপারে তাঁকে নিরুৎসাহিত করত, এখন তারাই নিজেদের মেয়েদের জ্যোতির মতো হওয়ার উৎসাহ দেয়। জ্যোতি আরটিও কার্যালয়ে ট্রায়াল দিয়ে ট্রাক্টর চালানোর লাইসেন্স পায়। ওইসময় সেখানে নিযুক্ত আরটিও— এ কে খজুরিয়া জ্যোতির উৎসাহ দেখে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং জ্যোতির এই উদ্যমকে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, এরকম মেয়ের জন্য আমাদের গর্ব হয়।

জ্যোতি জানায়, ছোটোবেলা থেকেই সে সুরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেবার স্বপ্ন দেখত। দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াকালীন সে এর জন্য প্রস্তুতি নেয় এবং প্রথম চেষ্টাতেই বিএসএফ-এ ভর্তি হয়। দেশের সেবা করার সুযোগ পেয়ে সে গর্বিত।

আজ, ওই অঞ্চলের মেয়েদের কাছে জ্যোতি আদর্শ। জ্যোতির গ্রামের মেয়েরাও আজ স্বাবলম্বী হতে চায়। জ্যোতি জানায়, কোনো কাজ ছোটো বা বড়ো নয়। কেবলমাত্র নিজের উদ্দেশ্য সৎ হওয়া প্রয়োজন। ছোট্ট গ্রাম সংগানীর মেয়ে জ্যোতি আজ তার সাফল্যের পথে চলেছে। তার জন্য রইল আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা! ▯

ক্রোনস রোগ ও হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

'ক্রোনস ডিজিজ'— নামটা আপামর জনসাধারণের কাছে নতুন শোনালেও কলকাতার গ্যাস্টোএন্ট্রোলজিস্টদের কাছে নামটা বেশ পরিচিত। প্রথমে সিভিয়ার ডায়েরিয়া বলে মনে হলেও ক্রোনস ডিজিজে অত্যাধিক রক্তক্ষরণ বেশ স্বাভাবিক। কিন্তু কোথা থেকে কালচে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে সাধারণ অ্যান্ডোস্কোপিতে বা কোলোনোস্কপিতে ধরা পড়ে না। চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হয়, ১৭৬১ সাল থেকে এই রোগের প্রকোপ দেখা দেয় সারা বিশ্বে। জীবনহানির তেমন কোনও সম্ভাবনা না থাকলেও অতিরিক্ত মাত্রায় রক্ত ক্ষরণের ফলে দেখা দেয় সিভিয়ার অ্যানিমিয়া। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ছাড়া তখন আর কোনও উপায়ই থাকে না। গত ৩০ বছরে এই শহরে বিভিন্ন প্রকার রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখেছি, খুব ভয়াবহ আকারে না দেখা গেলেও এদেশে প্রতি এক লক্ষ মানুষের মধ্যে ১০ থেকে ১২ জন এই রোগের শিকার বর্তমানে। পারিবারিক জিনগত কারণ যেমন এই রোগের ক্ষেত্রে একটা বড়ো ভূমিকা নেয়, তেমনই থাকে পরিবেশ এবং খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন।

ঠিক কী হয় ক্রোনস রোগে?

এই রোগ একটি ক্রনিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ। যেটা মুখ থেকে শুরু করে পায়ুদ্বার পর্যন্ত শরীরের গ্যাস্টোইনটেস্টাইন ট্র্যাকের যে কোনও জায়গায় হতে পারে। এছাড়াও ফিসচুলা, অ্যাবসেস তো আছেই। এই ঘায়ের কারণেই পায়খানা করতে গিয়ে রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে। সঙ্গে থাকে পেটে অস্বাভাবিক ব্যথা, পাতলা পায়খানা, শরীরের ওজন কমে যাওয়া এবং অ্যানিমিয়া। ক্রোনস রোগে সাধারণত গ্যাঁটে ব্যথা, গলস্টোন, কিডনি স্টোন, চর্মরোগ, হার্ট এবং ব্রেনের অসুখ হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। জন্ডিস হওয়ার সংখ্যা অবশ্য কম।

পরিবেশ ও খাদ্যাভ্যাস কীভাবে এই রোগকে প্রভাবিত করে?

গত কয়েক বছরে ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরগুলির মতো কলকাতাতেও মানুষের খাদ্যাভ্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আগে সাধারণ মানুষ জলখাবার হিসেবে বাড়িতে তৈরি রুটি আর একটা সবজি খেতেন। কেউ-বা বাদাম আর মুড়ি। এখন সেইসব খাবার একরকম উঠেই গিয়েছে। পশ্চিমি সভ্যতার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমাদের খাদ্যতালিকায় ঢুকে পড়েছে বার্গার, বিভিন্ন রোল, প্যাটিস-সহ নানা ধরনের ফ্যাট জাতীয় খাবার। বাড়িতে তৈরি খাবার এখন খুব কম মানুষকেই খেতে দেখা যায়। বেশিরভাগই পছন্দ করেন ফাস্টফুড সেন্টার থেকে কিনে আনা খাবার খেতে। শাকসবজি এবং ফলের খুব একটা প্রচলন আজকাল দেখা যায় না। এছাড়াও আছে ধূমপান, ব্যথার ওষুধ এবং অপরিমিত মদ্যপানের অভ্যাস। ধূমপান এবং মদ্যপান এই রোগ বাড়িয়ে তোলে।

কীভাবে ধরা হয় এই রোগ?

আমাদের একটা অভ্যাস আছে-পেটে ব্যথা হলেই আমরা টপাটপ অ্যান্টাসিড খেয়ে নিই। কিন্তু জেনে রাখা ভালো, কোনো ব্যথাই গ্যাসের ব্যথা নয়। কারণ চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্যাস বলে কোনও রোগ নেই। পেটে ব্যথা যেমন একটা উপসর্গ বা কষ্ট গ্যাসও তেমনই একটি উপসর্গ। কারও যদি বারবার পেটে ব্যথা হয়, পাতলা পায়খানা হয়, গ্যাস হওয়া বেশিদিন চলতে থাকে, তাহলে বিলম্ব না করে গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজিস্টকে দেখানো উচিত। মনে রাখতে হবে, পাতলা পায়খানা মানেই কিন্তু আমাশা নয়। দেখা গিয়েছে শতকরা ১০০ জনের যদি পাতলা পায়খানা হয়, তাহলে তার মধ্যে মাত্র পাঁচ থেকে সাতজনের আমাশা। বাকিদের অন্য কোনও রোগ। আমরা যাঁরা এই শহরে গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি চিকিৎসা করি তাঁরা বলতে পারি ক্রোনস রোগ ধরার সবচেয়ে সহজ উপায়। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এবং কোলোনোস্কপি নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ভয় থাকলেও বলি এই পরীক্ষা করতে সময় লাগে ঠিক দু-আড়াই মিনিট। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে তা করলে ভয়ের কোনও কারণ নেই। কোনও রকম ব্যথা তো লাগবেই না খুবই অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে পরীক্ষা। শুধুমাত্র ফিসচুলা বা অবস্ট্রাকশন অ্যাবসেস থাকলেই অপারেশন প্রয়োজন হয়। নয়তো ওষুধেই সেরে যায় এই রোগ। নিয়মিত ওষুধ খেলে কয়েক মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে যান রোগী।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :

ক্রোনস রোগে লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়। আমি যে সমস্ত ওষুধগুলি ব্যবহার করে কাজ পেয়েছি সেগুলি হলো— টিউবার, কুলিনাম, ব্রোটোনিকা, লাইকোপডিয়াম, ব্লুডো, কুয়েসিয়া অরনিথোগ্যাসিয়াম, পডোফাইলাম, নাক্সভূমিকা, অ্যামব্রোসিয়া ক্রুরেসিয়া প্রভৃতি। তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওষুধের শক্তি নির্ধারণ করেন। যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(লেখক বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক)

চব্বিশ ঘণ্টায় মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের প্লাস্টার হয়ে গেল ক্রেপ ব্যান্ডেজ

সুজিত রায়

সত্যজিৎ রায় আজ আমাদের মধ্যে থাকলে স্বনামধন্য গোয়েন্দা প্রবর ফেলুদা ওরফে প্রদোষ মিত্তিরকে দিয়ে নিশ্চিতভাবেই বলাতেন, 'ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না রে তোপসে। ওইরকম শক্তপোক্ত প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে গাবদা-গোবদা পা-জোড়া ব্যান্ডেজ। ২৪ ঘণ্টায় কী করে ক্রেপ ব্যান্ডেজে পরিণত হলো? ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হচ্ছে রে।'

সত্যিই রহস্য। এই চক্রান্ত, হামলা, গুন্ডামি বলে হাজারো অভিযোগ। ছ' জন সাংসদ ছুটলেন দিল্লি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাতে— দিদিকে খুনের চেষ্টা হয়েছিল। অ্যাটেম্পট টু মার্ডার। ভারতীয় ফৌজদারি বিধির ৩০৭ ধারার অভিযোগ। অথচ রাত কেটে ভোরের সূর্য উঠতে না উঠতেই খবরের কাগজের প্রথম পাতা জুড়ে খবরের শিরোনাম— মুখ্যসচিবের রিপোর্টেও 'হামলা' নেই। যদিও 'দুর্ঘটনা'র তত্ত্ব মানতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। নেতৃত্ব মানে সাংসদ সৌগত রায় যিনি দিদির বিবৃতিরও ওপর দিয়ে যান, এও এক রহস্য।... টান টান থ্রিলারের মতো।

ভোটবাজারে দিদি-সর্বস্ব তৃণমূল রাজনীতির এমন রহস্য নাটক নতুন কিছু নয়। ঘাসফুলের জন্মাবধি বাঙ্গলার মানুষ এমন নাটক

> সব মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা বানানো যায় না

দেখতেই অভ্যস্ত। সেই যে রাজপথে গাড়ির বনেটে বসে গলায় শাড়ির আঁচল জড়িয়ে আত্মহত্যার নাটক! না, না। বাঙ্গালি ভোলেনি। এসব দেখেই বেশ রসিয়ে কষিয়ে সেদিন দিদির গুরু সেকালের তরমুজ রাজনীতির প্রধান মুখ বড়ো হাসিমুখে বলেছিলেন, 'মমতা কেন যে এত মিথ্যে কথা বলে আর ভালো শাড়ি ছিঁড়ে সেলাই করে পরে, তা বুঝি না। একেবারে বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না।'

ওসব পুরনো প্রসঙ্গ থাক। টাটকা খবরে চোখ বোলানো যাক। প্রতিবারের মতোই এবারের ভোটপ্রচারের শুরু থেকে প্রায় প্রতিটি জনসভাতেই দিদি বলছিলেন, 'আমার গোটা শরীরে আঘাতের চিহ্ন। মার খেতে খেতে আমি আর মারকে ভয় পাই না। আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বিরোধীরা ক্ষতবিক্ষত

করে দিয়েছে। আমার মাথায় যন্ত্রণা হয়। চোখ টনটন করে। বুকে কষ্ট হয়।' অর্থাৎ আভাস দিদি দিচ্ছিলেন। ক'দিন আগেই স্কুটি চালানো শিখতে গিয়ে ৬৫ বছরের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসা পা দুটি ভাঙতেই পারত। ভাঙলে হয়তো বলতেন, পুলিশের মধ্যে বিজেপির লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কপাল ভালো, নিরাপরাধ পুলিশ কর্মীদের সে অভিযোগ শুনতে হয়নি। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, নাটকের পটভূমি নন্দীগ্রামই হবে। হবে, কারণ নন্দীগ্রাম এবার তার কাছে অ্যাসিড টেস্ট। এত প্রবল চাপের মুখে তাঁকে রাজনৈতিক জীবনে কখনও পড়তে হয়নি। খোদ কালীতীর্থ ভবানীপুর ছেড়ে সিংহবাহিনীর গড় নন্দীগ্রামে খ্যাপা ষাঁড়ের পিঠে চাপার সিদ্ধান্তটা তিনি ভেবেচিন্তে নিয়েছিলেন বলেতো মনে হয় না। ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিলেন। আর ফেরানোর উপায় ছিল না। কিন্তু বুঝেছিলেন, বয়সে অনেক ছোটো (যদিও রাজনীতিতে অনেক পোক্ত) শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়াটা তাঁর পক্ষে (যেহেতু তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং দলনেত্রী) বেমানান হয়ে গেছে। হয়তো এমনও ভেবেছিলেন, ভয় পেয়ে ল্যাজ গুটিয়ে পালাবেন শুভেন্দু। ভাবেনইনি যে, শুভেন্দু পাল্টা হুংকার দিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবেন, 'মাননীয়াকে হাফ লাখ ভোটে হারাব— হারাবই।'

নন্দীগ্রামে ভোটপ্রচারে পা রেখেই বুঝেছিলেন— হাওয়া বিপরীতমুখী। তাই প্রথম সভাতেই প্রার্থীপদ জমা দেওয়ার আগেই জনসভায় সমাগত মানুষজনের সম্মতি চেয়েছিলেন— 'এখানে দাঁড়াব তো?' অর্থাৎ ভয়টা ছিল প্রত্যক্ষ। তাঁর মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পক্ষে একই সঙ্গে আরও এক জায়গায় (ইচ্ছে ছিল টালিগঞ্জ থেকে দাঁড়ানোর) প্রার্থী হওয়াটাও অপমানের। অতএব লড়তে হবে। লড়তে হলে নাটক ছাড়া গতি নেই। অতএব সেই পরিকল্পনারই হাত ধরে চলন্ত গাড়ির পাদানিতে দাঁড়িয়ে জনসংযোগ প্রচেষ্টা এবং আচমকাই গাড়ির দরজার ধাক্কায় গাড়ির সিটে আছড়ে পড়া।

না, না। এতটা নির্দয় ভাববেন না আমাদের। আমরা জানি, তাঁর পায়ে লেগেছে। গোড়ালির হাড় যে ফুলে গেছে তা তো টিভির পর্দাতেই দেখা গেছে। আরে বাবা, বয়স তো হয়েছে। কচি খুকি তো আর নন। হাড়ের জোর তো কমেছেই। কিন্তু নাটকটা অন্য জায়গায়, যখন

১৪ ঘণ্টায় প্লাস্টার থেকে ক্রেপ ব্যান্ডেজ, ২৪ ঘণ্টায় 'হামলা' থেকে 'দুর্ঘটনা'য় রূপান্তরধর্মী বাস্তবতা দিদিকে অ্যাডভান্টেজ দিল কতটা? কিংবা ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা সমস্ত টেলিভিশন চ্যানেলে শুধু প্লাস্টার করা মুখ্যমন্ত্রীর পা দেখানোটা দিদিকে টেনে নিয়ে গেল কতটা ব্যাকফুটে?

বললেন, চার-পাঁচজন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে আছড়ে ফেলেছে।

বাঙ্গলার মানুষ রাজনীতির নাটক এবং কলাকুশলীদের দেখে দেখে অনেক কিছুতেই অভ্যস্ত। তারওপর আজকের যুগ আধুনিক টেকনোলজির যুগ। ভিডিয়োর পর ভিডিয়ো আছড়ে পড়ল সোশ্যাল মিডিয়ার বেলাভূমিতে। দেখা গেল, দিদি দাঁড়িয়ে গাড়ির পাদানিতে। মানুষ আছে রাস্তায়। কিন্তু দিদির পিছনে দাঁড়িয়ে সদাসতর্ক ব্যক্তিগত প্রহরীরাও। ভয়ের প্রাচীর ভেঙে স্থানীয় মানুষজনও সত্যিকথাই বলেছিলেন— কেউ ঠেলেনি। রাস্তার পাশের লোহার বিমে ধাক্কা লেগেই গাড়ির ভারী পাল্লা আছড়ে পড়েছে দিদির পায়ের ওপর। প্রাথমিক পর্যায়ে জনসহানুভূতি কাড়তে নাটকীয় সংলাপ বলেছিলেন বটে। কিন্তু যখন দেখলেন, বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে তখন সংলাপ পাল্টালেন। বললেন, গাড়িটা আচমকা পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে। সেটাও ঠিক নয়। হয়তো একটু ভুল বলে ফেলেছেন অন্য নাটক করতে গিয়ে।

কিন্তু ওই যে বলে না, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। তৃণমূলি নেতাদেরও হয়েছে তাই। প্রথম দিন থেকেই পোষ্য সাংবাদিকদের ডেকে ডুকে এনে সৌগত রায় যাঁকে এখন সকলেই তৃণমূলের ঠাকুর্দা বলে সম্বোধন করেন আর দিদির সংখ্যালঘু ভাই ফিরহাদ হাকিম গাড়ির দরজা খুলে হাজারো যুক্তির বন্যা বইয়ে এমন সব সংলাপ বলতে শুরু করলেন যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা যাই বলুন কিংবা স্বয়ং দিদি যাই বলুন, পারিষদ হিসেবে তাঁদের মহান কর্তব্য হলো— ষড়যন্ত্র তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করা এবং তা বিজেপি-র বিরুদ্ধে। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে— শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে যিনি এই দুর্ঘটনা অথবা হামলা নিয়ে কোনও মন্তব্যই করেননি। শুধু পোক্ত রাজনীতিবিদের মতোই বলেছেন, 'রাজনীতির প্রশ্ন করুন। জবাব দেব।' অর্থাৎ নাটকের জবাব তিনি দেবেন না। দেননি।

আর সত্যটা আরও স্পষ্ট করে দিলেন স্বয়ং মুখ্যসচিব তাঁর রিপোর্টে— যেখানে কোথাও কোনো হামলার কথা বলা হয়নি। চার- পাঁচজন লোকের ধাক্কার কথা বলা হয়নি। বরং রাস্তায় দুটো খুঁটি থাকার কথা বলা হয়েছে। রিপোর্ট পৌঁছে গেছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। নির্বাচন কমিশন বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁদের নয়। এ দায়িত্ব রাজ্যের। হায়রে! সৌগত রায়ের মতো সিজিন্ড সাংসদ এটাও জানতেন না। এ দুঃখ বাঙ্গলার মানুষ রাখবে কোথায়?

এখন কথা হলো— ১৪ ঘণ্টায় প্লাস্টার থেকে ক্রেপ ব্যান্ডেজ, ২৪ ঘণ্টায় 'হামলা' থেকে 'দুর্ঘটনা'য় রূপান্তরধর্মী বাস্তবতা দিদিকে অ্যাডভান্টেজ দিল কতটা? কিংবা ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা সমস্ত টেলিভিশন চ্যানেলে শুধু প্লাস্টার করা মুখ্যমন্ত্রীর পা দেখানোটা দিদিকে টেনে নিয়ে গেল কতটা ব্যাকফুটে?

না, আমরা কোনো মন্তব্য করছি না। নন্দীগ্রামের ভোটের ফল তার জবাব দেবে। আমরা শুধু বলব— স্বামী বিবেকানন্দের সেই মহৎ উক্তি— 'চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কার্য সমাধা করা সম্ভব নহে।' যুগ পাল্টেছে। বাঙ্গলার রাজনীতিও পাল্টেছে। আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই উক্তিটাই বোধহয় ভোটের ফলে স্পষ্ট হয়ে যাবে— 'সব মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা বানানো যায় না।'

তা সে মাথার ব্যান্ডেজ হোক কিংবা পায়ের প্লাস্টার। এবার অবশ্য অন্য উপকরণ—হুইল চেয়ার।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

হুইলচেয়ারের নাটক করে কি সহানুভূতি জুটবে?

হীরক কর

সম্প্রতি টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলগুলোতে টেলিকাস্টিং হওয়া একটি ভিডিয়ো অনেকেরই চেনা চেনা ঠেকেছে। ঘটনাটা হুবহু টালিগঞ্জ পাড়ার একটি ছবির রিমেক। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। ছবির নাম, 'ওয়ান্টেড'। ২০১০-এর জিৎ-শ্রাবন্তী অভিনীত ছবি। সেই ছবির সঙ্গে দশই মার্চ নন্দীগ্রামে আহত হওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিউজ ভিডিয়োর কতই না মিল। 'ওয়ান্টেড' ছবির সেই ভিডিয়ো ক্লিপিং এখন ভাইরাল। মাত্র ২৭ সেকেন্ডের ওই ক্লিপিংয়ে দেখা যাচ্ছে এক রাজনৈতিক নেতা তাঁর দলের কর্মীদের ডায়লগ দিচ্ছেন, 'আমাদের ইলেকশন ক্যাম্পেন শুরু হচ্ছে দশ তারিখে, সেদিন আমার উপর অ্যাটাক হবে। সমস্ত টিভি মিডিয়া কভার করবে। আমি বেডে শুয়ে মিডিয়াকে বাইট দেব। তারপর জনগণের কাছে হুইলচেয়ারে বসে ভোট চাইব।'

বলতে পারেন কাকতলীয়। যদিও ঘটনাচক্রে তা সত্যি সত্যিই মিলে যায় বর্তমান ঘটনার সঙ্গে। ১০ মার্চ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে প্রচারে গিয়ে আহত হন। নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে একাধিক মন্দির পরিদর্শন করেন মমতা। সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি মন্দির থেকে ফেরার পথে তাঁর ওপর হামলা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। মমতা নিজেই গাড়িতে শুয়ে শুয়ে চিৎকার করতে থাকেন, '৪-৫ জন মিলে আমার গাড়ির দরজা চেপে ধরে আমার পা-টা ভেঙে দিল। সব বিজেপির ষড়যন্ত্র'। তাঁকে দ্রুত কলকাতায় ফিরিয়ে এনে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গঠন করা হয় ৬ সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড। বাঁ পায়ে প্লাস্টার করা হয় তাঁর। ১০ মার্চ বুধবার এই ঘটনা ঘটলে পরদিন ১১ মার্চ তিনি নিজে ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে উডবার্ন ওয়ার্ডের ভিআইপি বেডে শুয়ে শুয়ে সকলকে তার পায়ের বিশাল প্লাস্টার দেখান। ১২ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যায় চিকিৎসকদের বারণ সত্ত্বেও তিনি হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তখন তার পায়ে শুধুই ক্রেপ ব্যান্ডেজ আর স্পেশাল চটি। চিকিৎসক মহলেই প্রশ্ন উঠেছে, পা ভাঙলে দুদিনের মধ্যে প্লাস্টার কেটে ফেলা কীভাবে সম্ভব? আর ক্রেপ ব্যান্ডেজ লাগিয়ে হুইলচেয়ারে বসাও তো বিস্ময়কর। এসএসকেএম হাসপাতালে যে চিকিৎসকরা এই মিরাকেল ঘটিয়েছেন তাদের তো নোবেল পাওয়া উচিত।

পা ভাঙলে দুদিনের মধ্যে প্লাস্টার কেটে ফেলা কীভাবে সম্ভব? আর ক্রেপ ব্যান্ডেজ লাগিয়ে হুইলচেয়ারে বসাও তো বিস্ময়কর। এসএসকেএম হাসপাতালে যে চিকিৎসকরা এই মিরাকেল ঘটিয়েছেন তাদের তো নোবেল পাওয়া উচিত।

ভাইরাল হওয়া ওই ক্লিপিং আসলে নেওয়া এসকে মুভিজের পেজ থেকে। এটি জিৎ-শ্রাবন্তীর ছবি। ২০১০ সালে মুক্তি পাওয়া 'ওয়ান্টেড' ছবির দৃশ্য। এসকে মুভিজের পেজে এই ক্লিপিংটি রয়েছে মোট ৩ মিনিট ১৯ সেকেন্ডের। ২৫

এপ্রিল ২০২০ সালে এই ভিডিয়োটি ছাড়া হয়েছিল। ক্যাপশনে দেওয়া হয়েছিল, 'এভাবেও ভোটে জেতা যায়?' নিন্দুকেরা বলছেন এই ছবি থেকেই ঘটনার 'স্ক্রিপ্ট সাজিয়েছে' তৃণমূল।

বর্তমান বিজেপি হাওয়ায় মাস দুয়েক আগে নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র শুভেন্দু বিজেপিতে যোগ দেন। এতে ক্ষিপ্ত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীগ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন সেখান থেকেই প্রার্থী হবেন তিনি। শেষ পর্যন্ত কথা রাখেন। 'আমি কথা রেখেছি' বলে দম্ভের সঙ্গে ১০ মার্চ তমলুকে মহকুমা শাসকের অফিসে মনোনয়নপত্র পেশ করতে যান। সেখান থেকে একটি নাম সংকীর্তনের আসরে যাবেন বলে ওই দিন সন্ধ্যায় বিরুলিয়া বাজারের রাস্তা ধরেন। গাড়ির দরজা খুলে ঝুলতে ঝুলতে মানুষজনকে হাতজোড় করে নমস্কার করতে করতে এগোতে থাকেন। এই সময় তার চিৎকার— ৪-৫ জন মিলে আমাকে মেরে ফেললো গো। ভেঙে গেছে বলে 'পা' দেখান। তার ফোলা পায়ের ছবি দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশি তদন্তে দেখা যায় বিরুলিয়া বাজারের বাঁকের মুখে দুটি লোহার পাইপ পোঁতা আছে। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি যখন এগোতে যায় ওই পাইপে ধাক্কা লেগে গাড়ির দরজায় আঘাত পান মুখ্যমন্ত্রী। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে গাড়ির দরজায় কোনো চিড়ের দাগ নেই কেন? জানা যায়, কয়েকজন তৃণমূল সমর্থক গ্রামবাসী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গাড়িটিকে ওই পাইপগুলোর থেকে বাঁচাবার জন্য দরজার দিকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। আর তাতেই চিৎকার করে ওঠেন মমতা।

এই সার সত্যিটি বলে ফেলেন বিরুলিয়া মোড়ের মাইতি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক নিমাই মাইতি। ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন তিনি জর্জরিত ছিলেন। স্থানীয় মানুষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, পুলিশ, ইন্টেলিজেন্ট এজেন্সি এবং নানান সংবাদ মাধ্যমের লোকেদের প্রশ্নের মুখে পড়ে তাকে নাজেহাল হতে হয়। সকলকেই বলেন, কেউ ষড়যন্ত্র করেনি। পাইপ থেকে বাঁচাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ির দরজায় ধাক্কা লেগে যায়। তাতেই গোঁসা হয় তৃণমূলীদের। কয়েকদিন আগে তৃণমূলের কিছু ছেলেপুলে মাইতিবাবুকে রীতিমতো চমকে গেছে। এখন মাইতিবাবু বলছেন, সেদিন এমনি ভিড়ের মধ্যে গাড়ির দরজায় ধাক্কা লেগে গিয়েছিল। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষড়যন্ত্রের যুক্তি নন্দীগ্রামবাসীর আত্মসম্মান বোধে আঘাত করেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নন্দীগ্রামের ঠিকানা এখন রেয়াপাড়া। সেইখানে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। সেই বাড়ি দেখভালের দায়িত্বে অশোক চক্রবর্তী। যিনি কিছুদিন আগে পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর সিকিউরিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ইন্সপেক্টর হিসেবে অবসর নিয়েই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এখন নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির প্রাইভেট সিকিউরিটির দায়িত্বে। বারবার সাংবাদিকদের কাছে খোঁজ নিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতবেন তো? অবস্থা কী? বলছেন, তৃণমূলের সমর্থনে লিখতে। ফোন করছেন এসডিপিওকে। কেননা তাঁর মনে হচ্ছে রেয়াপাড়ার সাহেব তাঁকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না। অশোকবাবুর মনে হচ্ছে তিনি অবসর নিয়েছেন বলেই কি পুলিশ আর তাকে সমীহ করছে না। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি হলেও সেখানে জনতার লাগামছাড়া ভিড় নেই। এই বাড়ির পাশেই শুভেন্দুর ব্যানার আর বিজেপির পতাকা পতপত করে উড়ছে। মমতা এলে যদিও-বা একটু ভিড়ভাট্টা হয় ১৪ মার্চ নন্দীগ্রাম দিবসে দোলা সেন, ব্রাত্য বসুদের সভায় একদমই ভিড় ছিল না। পাশের সভায় শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে জনতার ভিড়। তৃণমূলের সভা থেকে মানুষ ঘাড় ঘুরিয়ে ছিলেন নিজেদের ঘরের ছেলে শুভেন্দুর দিকেই।

প্রশ্ন হলো 'ওয়ান্টেড' ছবির স্ক্রিপ্ট বিরুলিয়া বাজারে পুনর্গঠন করতে হলো কেন? ওয়াকিবহাল মহল বলছে, কয়েকদিন আগে নবান্নে একটি ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পেয়েছিলেন সরকারের কর্তারা। যেখানে বলা হয়েছিল, নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক লক্ষেরও বেশি ভোটে হারবেন। মুখ্য সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ম্যাডামকে বুঝিয়েছিলেন, নন্দীগ্রাম 'রিস্কি' জোন'। ওখান থেকে না দাঁড়ানোই ভালো। তৃণমূল নেতারা বলেছিলেন টালিগঞ্জ সেফ সিট। নন্দীগ্রামের পাশাপাশি টালিগঞ্জ থেকেও প্রার্থী হোন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টালিগঞ্জের অরূপ বিশ্বাস যেতে পারেন মানিকতলায়। মানিকতলার সাধন পাণ্ডে এমনিতেই গুরুতর অসুস্থ। তাকে বরং উইথড্র করে নেওয়া হোক। এদিকে টালিগঞ্জ অরূপ বিশ্বাসের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে পড়েছেন বাবুল সুপ্রিয়। ফলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই স্পষ্ট। তাই হয়তো রাজি হননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জেদ, নন্দীগ্রামে আমি এককভাবেই লড়বো।

এই লড়াই লড়তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত 'ওয়ান্টেড' সিনেমার স্ক্রিপ্ট ধার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল! ওই ছবির অভিনেতার কথামতো, ঘটনার দুদিনের মধ্যে জনসমক্ষে এলেন। হুইলচেয়ারে বসলেন। পুরুলিয়া, দুর্গাপুর, ঝাড়গ্রামে সভা করতে গেলেন। রাম্পে করে সভা মঞ্চে উঠলেন। সিএম সিকিউরিটি লোকেরা হুইল চেয়ার টেনে টেনে তুলল। বললেন, 'ভাঙা পা নিয়েই আমি ভয়ংকর। খেলা হবে এক পায়েতেই। আমি ভাঙি কিন্তু মচকাই না।' কেউ কেউ রসিকতা করে বলেছেন, খেলা হলে প্রতিপক্ষ নীল-সাদা জার্সির বাঁ পা-টাকেই বেশি অ্যাটাক করে। মেসি, মারাদোনাকেই দেখুন না।

হুইল চেয়ারে বসে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোড়হাতে ভোটভিক্ষা করেছেন। এমন ছবি এখন দেওয়ালে দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে। এলাকার মানুষের চোখ টানছে। যেমন, রানাঘাট উত্তর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শংকর সিংহের নামে দেওয়াল লিখনে ঠাঁই পেয়েছে হুইল চেয়ারে বসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। প্রার্থীর নামের পাশে তৃণমূল নেতৃত্ব সেই দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন ফুলিয়া থেকে বাদকুল্লা যাওয়ার পথের বিভিন্ন দেওয়ালে। হুইল চেয়ারে বসা মুখ্যমন্ত্রীর এই ছবিকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রশ্ন এখন সব মহলেই, হুইল চেয়ারের নাটক করে কি সহানুভূতি জুটবে?

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

মুখ্যমন্ত্রী জেড্ প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পান। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা তো তাঁর হাতেই, তিনি তো পুলিশ মন্ত্রীও। উনি যদি এরকম ভাবে আক্রান্ত হন, তাহলে রাজ্যবাসীর কী অবস্থা হবে? এর সত্যাসত্য বিচার করুক নির্বাচন কমিশন।

মুখ্যমন্ত্রীর আঘাত পাওয়া প্রমাণ করে বোতলবন্দি দৈত্য ছাড়া পেয়েছে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

নন্দীগ্রামের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর সন্ধ্যায় প্রচারে বেরিয়ে আহত হয়েছেন তিনি। রাতেই তাঁকে গ্রিন করিডোর করে কলকাতায় নিয়ে এসে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে পাঁচ সদস্যের একটি মেডিক্যাল টিমও গঠন করা হয়েছিল।

তিনি অভিযোগ করে বলেছেন--- 'মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরোনোর সময় তাঁকে ধাক্কা মারে চার-পাঁচজন। এর জেরে তাঁর মাথায়, কপালে এবং পায়ে চোট লেগেছে। গোটা ঘটনায় ষড়যন্ত্র রয়েছে।' তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, 'কেউ মুখ্যমন্ত্রীকে ধাক্কা মারেনি। ভিড়ের মধ্যেই একটি খুঁটিতে হোঁচট খেয়ে তিনি পড়ে যান।'

নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর আহত হওয়ার ঘটনাকে মানুষ সহানুভূতি আদায়ের নাটক মনে করছে, বিজেপি এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবিও জানিয়েছে।

মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, 'তাঁকে যখন ধাক্কা মারা হয়, তখন সেখানে শুধু তাঁর নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। কোনও পুলিশকর্মী ছিলেন না।' বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক এই খানেই প্রশ্ন তুলে বলেছেন--- 'এটা সহানুভূতি কুড়ানোর প্রয়াস। যদি উনি চক্রান্তের অভিযোগ করেন, তাহলে দ্রুত এই ঘটনার তদন্ত সিবিআই-এর হাতে দেওয়া হোক। উনি শুধু বিরোধীদের বদনাম করার চেষ্টা করছেন। উনি যখন রাস্তায় মিছিলে হাঁটেন, তখন তাঁর ২০০ গজের মধ্যে কাউকে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না। ওঁর ধারেপাশে যদি কেউ গিয়ে থাকেন, তাহলে তো সেটা ওঁরই পুলিশের গাফিলতি। সিবিআই-কে দিয়ে তদন্ত করালেই সত্য প্রকাশিত হবে। সেটা উনি করাচ্ছেন না কেন?'

বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন— 'এই ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি হোক। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর নিরাপত্তার কোনও ফাঁক থাকলে তা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করে দেখা উচিত। মুখ্যমন্ত্রীর আশেপাশে কেন তখন কোনো পদস্থ পুলিশ অফিসার বা পুলিশকর্মী

ছিলেন না, তা জানার জন্যই তদন্ত দরকার।'

বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেছেন— 'উনি তো মুখ্যমন্ত্রী। জেড্ প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পান। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা তো তাঁর হাতেই। উনি যদি এরকম ভাবে আক্রান্ত হন, তাহলে রাজ্যবাসীর কী অবস্থা হবে? যাই হোক না কেন, তদন্ত করে দেখা হোক। মুখ্যমন্ত্রীর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ খতিয়ে দেখুক নির্বাচন কমিশনও।'

মুখ্যমন্ত্রীর চোট পাওয়া এবং হাসপাতালে ভর্তির খবর শুনে রাজ্যপাল তড়িঘড়ি হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে। কিন্তু হাসপাতালে রাজ্যপালকে উদ্দেশ্য করে বিজেপির দালাল এবং গো-ব্যাক ধ্বনি দিয়েছে তৃণমূল সমর্থকেরা। তৃণমূলের অনেক নেতা-মন্ত্রীও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে হাসপাতালে যান। মুখ্যমন্ত্রীর চোট পাওয়ার খবরে বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল দলের কর্মী-সমর্থকরা এজন্য রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। চোটের কারণ কী, কে এই ঘটনা ঘটালো ইত্যাদি বিষয় পরিষ্কার হওয়ার আগেই রাজ্য-রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেছেন— 'বাঙ্গলার মেয়েকে আঘাত করা হয়েছে, এই আবেগ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই স্পষ্টত নাটক করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' তিনিও প্রশ্ন তুলেছেন— '...সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী, একজন মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে থাকে অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী। তিনি যেখানে যান তাঁর চারপাশে মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব নিরাপত্তা ছাড়াও ছড়ানো থাকে সিসিটিভি ক্যামেরা, ইন্টেলিজেন্স-এর লোকজন এবং সাদা পোশাকের পুলিশ। তাই এতগুলো নিরাপত্তাবলয় ভেদ করে মুখ্যমন্ত্রীকে আঘাত করল তিন-চারজন যুবক, এটা কাচ্চা-বাচ্চারাও বিশ্বাস করবে না। আর যদি এটাকে সত্যি বলে মানতে হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে এই সরকারের শাসনকালে কী মারাত্মক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ বেঁচে আছেন এবং এই মুহূর্তে মমতার পুলিশের কী অবস্থা, সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

তবে রাজনীতির লোকেরা যে যাই বলুন না কেন, সাধারণ রাজ্যবাসী মনে করেন, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান এবং তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও বটে। সুতরাং তাঁর মতো সম্মাননীয় ব্যক্তিত্ব যখন চোট-আঘাত পান তখন মানতেই হবে এই রাজ্যে শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি এরাজ্যে গুন্ডা, মস্তান, সমাজ-বিরোধী, সন্ত্রাসবাদীদের খুল্লামখুল্লা মারপিট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি। বিরোধী দলের নেতা-কর্মী এমনকী বিধায়ককেও মেরে ফেলে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়ার এবং বিরোধী সমর্থকদের ঘরবাড়ি পোড়ানো, সম্পদ লুট করার দৃশ্য। কোনো ক্ষেত্রেই অপরাধীদের কঠিন শাস্তি পাওয়ার কথা জানা যায়নি। বহুক্ষেত্রে অপরাধীরা ধরা পড়ে না, ধরা পড়লেও কোর্টে তোলার পর সহজেই তারা জামিন পেয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং অপরাধীদের সম্পর্কে বাচ্চাছেলে, ছোটো ছেলে, ছোটো ঘটনা, দুষ্টু ছেলে, এমনকী ধর্ষিতা সম্পর্কে— 'মেয়েটির চরিত্র খারাপ ছিল' ইত্যাদি মন্তব্য করে অপরাধীদের আরও অপরাধ করার উৎসাহ জুগিয়েছেন।

এরাজ্যে বিরোধীদের কোনোরকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে দেওয়া হয় না। তারও বহু প্রমাণ পেয়েছে রাজ্যবাসী। প্রায় এক বছর আগে আসানসোল, কালিয়াগঞ্জ ও করিমপুর বিধানসভার উপনির্বাচনের প্রচারের সময় করিমপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জয়প্রকাশ মজুমদারকে তৃণমূলের লুঙ্গি পরিহিত একজন রাস্তার ধারে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে লাথি মারতে দেখা গেছে। শমীকবাবুর অপরাধ ছিল, তিনি ভোট প্রচারে বেরিয়েছিলেন। তারও আগে টিভিতে দেখা গেছে বিজেপির এক মিছিলে তৃণমূলের একজন বিজেপির তরুণী কর্মীকে এমনভাবে লাথি মারল আর সেই তরুণী আট-দশ হাত দূরে ছিটকে রেল লাইনের ওপর পড়লেন। পুলিশ কিন্তু লুঙ্গি পরিহিত বাচ্চা ছেলেদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। রাজনৈতিক কর্মসূচি রূপায়ণে ডায়মন্ডহারবার যাওয়ার পথে বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে শিরাকোলে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল তা নজিরবিহীন। আক্রমণকারীরা রীতিমতো তৃণমূলের পতাকা হাতে সেই আক্রমণে শামিল হয়েছিল। ওই ন্যাক্কারজনক হামলার পর মুখ্যমন্ত্রী হামলাকারীদের প্রতি কোনোরকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ বা সতর্ক তো করেনইনি বরং তিনি অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করে বিজেপিকে আক্রমণ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথামতো সত্যিই যদি চার-পাঁচজন তাঁকে ধাক্কা মারে তাহলে বলতেই হয়— মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আইনের শাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অপরাধীদের প্রশ্রয় দিয়ে যেভাবে মাথায় তুলে দিয়েছেন তাতেই অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তাই তারা নির্ভয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকেও আঘাত হানতে সাহস পেয়েছে। কাজেই এক্ষেত্রে সবার আগে তদন্ত করে আসল ঘটনা তুলে ধরতে হবে। শুধু শুধু হইচই করে কিছু হবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর ওপর এই আঘাতকে পশ্চিমবঙ্গবাসী নাটক বলেই মনে করছেন। আমরা সাধারণ মানুষ আন্তরিক ভাবে কামনা করি, তিনি অতিশীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠুন। রাজ্যবাসী আরও আশা রাখেন, আগামীদিনে প্রশাসন কঠোরভাবে রাজ্যে আইনের শাসন বলবৎ করে নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের অধিকার দিবে। দলমত, জাতিধর্ম নির্বিশেষে কোনো রংয়ের বাছ-বিচার না করে অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। তা না হলে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা দুর্বৃত্তরা রাজ্যটাকে তছনছ করে দিবে। ◘

ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশনের রাজ্য সম্মেলন

'সুস্থ পশ্চিমবঙ্গ, আত্মনির্ভর পশ্চিমবঙ্গ' বিষয়ের ওপর গত ১৪ মার্চ কলকাতার রথীন্দ্র মঞ্চে ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন (এনএমও)-র রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিশ্বম্ভর সিংহ, এআইএমএস কল্যাণী শাখার ডিরেক্টর ডাঃ রামজী সিংহ, সংগঠনের সর্বভারতীয় যুগ্ম সংগঠন সম্পাদক ডাঃ ওমপ্রকাশ, মহারাষ্ট্রের ডাঃ হেডগেওয়ার হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ অতীন্দ্র আস্থাপুত্র। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বেলডাঙ্গা শাখার অধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ। পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবস্থার বিকাশ কীভাবে করা যায় সেবিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা মনোজ্ঞ আলোচনা করেন সম্মেলনে। সংগঠনের গত দুই বছরের কাজের প্রতিবেদন তুলে ধরেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মৃন্ময় অধিকারী।

'স্বাস্থ্য সেবা রাষ্ট্র সেবা' এই মন্ত্র নিয়ে চিকিৎসক ও চিকিৎসা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ শাখা রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে শপথ গ্রহণ করে। সম্মেলনে ৩৫০ জন বিশিষ্ট চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে একক গীত পরিবেশন করেন ডাঃ সন্দীপন নন্দন ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডাঃ অর্ণব পাল, ডাঃ রিমি বিশ্বাস, ডাঃ সুহৃদ রায়, ডাঃ শুভ চৌধুরী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের রাজ্য শাখার সভাপতি ডাঃ প্রভাত সিংহ।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ১৩ মার্চ কলকাতার প্রেস ক্লাবে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ড. নারায়ণ চক্রবর্তীর 'করোনা মহামারীর ইতিকথা' ও 'ধর্ম-শিক্ষা-রাজনীতি' নামে দুটি সময়োপযোগী পুস্তকের প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক মানস ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক সুজিত রায়, অধ্যাপক ও লেখক পুলকনারায়ণ ধর, স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, নাট্য ব্যক্তিত্ব ও লেখক শুভাশিস ঘোষঠাকুর ও স্বস্তিকা পত্রিকার সহ সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। সবাই বই দুটির সময়োযোগী প্রকাশনার জন্য ড. নারায়ণ চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ জানান। মননশীল পাঠকদের কাছে বইদুটি যথেষ্ট সমাদৃত হবে বলেও তারা মনে করেন। প্রকাশনার ব্যবস্থা করার জন্য লোকনাথ পাবলিশার্সকেও তারা ধন্যবাদ জানান। বইয়ের লেখক ড. চক্রবর্তী বইদুটি রচনার পটভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করে শ্রীমতী শিপ্রা সাধক।

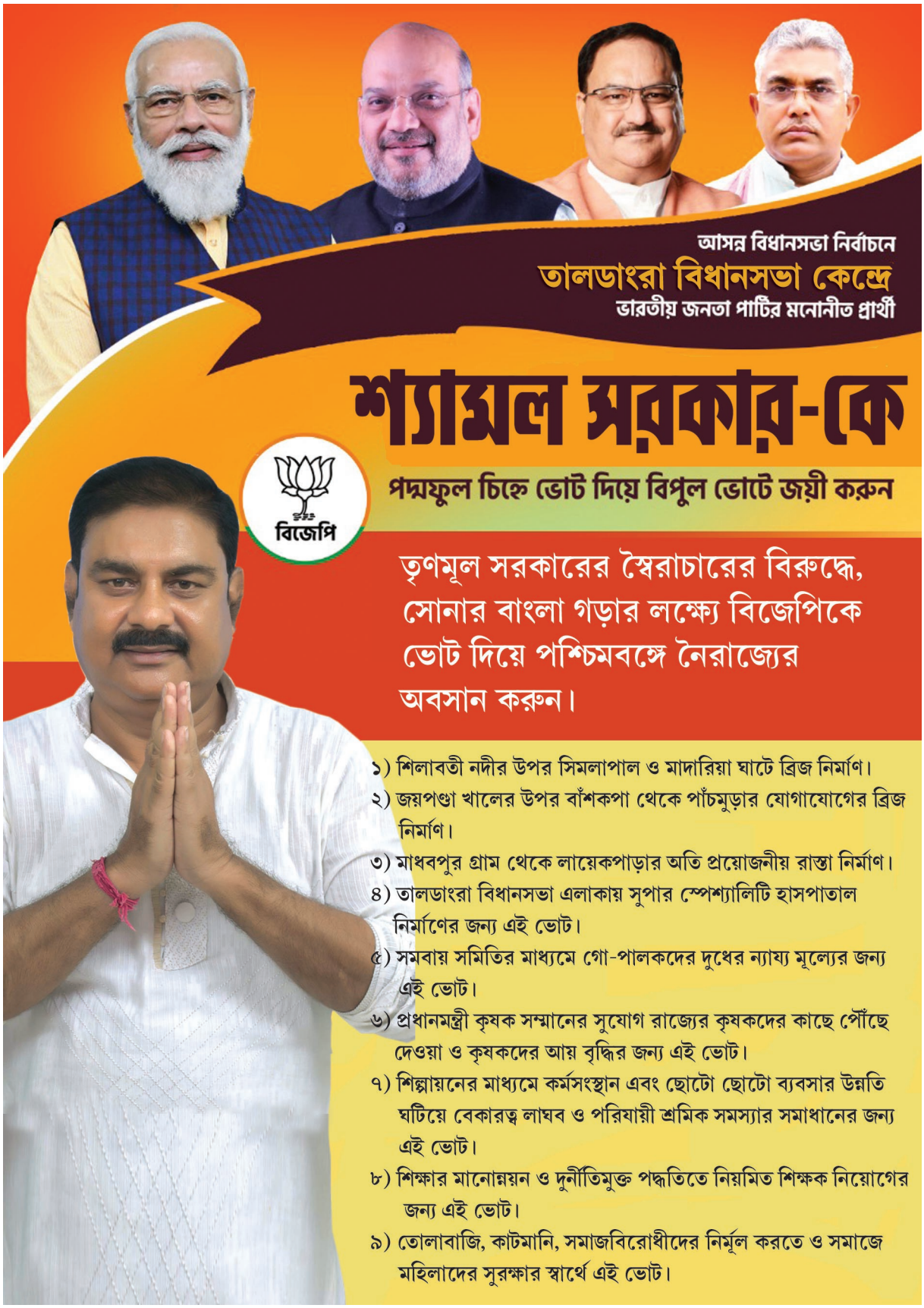
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে
তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রে
ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী
শ্যামল সরকার-কে
বিজেপি
পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন
তৃণমূল সরকারের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে,
সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বিজেপিকে
ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নৈরাজ্যের
অবসান করুন।
১) শিলাবতী নদীর উপর সিমলাপাল ও মাদারিয়া ঘাটে ব্রিজ নির্মাণ।
২) জয়পণ্ডা খালের উপর বাঁশকপা থেকে পাঁচমুড়ার যোগাযোগের ব্রিজ নির্মাণ।
৩) মাধবপুর গ্রাম থেকে লায়েকপাড়ার অতি প্রয়োজনীয় রাস্তা নির্মাণ।
৪) তালডাংরা বিধানসভা এলাকায় সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য এই ভোট।
৫) সমবায় সমিতির মাধ্যমে গো-পালকদের দুধের ন্যায্য মূল্যের জন্য এই ভোট।
৬) প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মানের সুযোগ রাজ্যের কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া ও কৃষকদের আয় বৃদ্ধির জন্য এই ভোট।
৭) শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান এবং ছোটো ছোটো ব্যবসার উন্নতি ঘটিয়ে বেকারত্ব লাঘব ও পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যার সমাধানের জন্য এই ভোট।
৮) শিক্ষার মানোন্নয়ন ও দুর্নীতিমুক্ত পদ্ধতিতে নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগের জন্য এই ভোট।
৯) তোলাবাজি, কাটমানি, সমাজবিরোধীদের নির্মূল করতে ও সমাজে মহিলাদের সুরক্ষার স্বার্থে এই ভোট।

মাদারগাছি উচ্চ বিদ্যালয় প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে

ড. বৃন্দাবন ঘোষ

মাদার গাছ থেকে মাদারগাছি নামের উৎপত্তি হয়। সেখানে শতাধিক বছর পূর্বে রামমোহন ঘোষের উদ্যোগে কার্তিক পুজো ও মেলা শুরু হয়। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদীঘির এই পুণ্যভূমিতে ১৯৫৬ সালের ১১ নভেম্বর চৌনগড়া মাদারগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। তার ফলে তখন ওই এলাকার ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতো।

সুরেশ চন্দ্র ঘোষ, কেদারনাথ ঘোষ, হরিমোহন ঘোষ, শিশির চন্দ্র ঘোষ, দিলীপ কুমার ঘোষ, রমেশ চন্দ্র ঘোষ, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, দীনেশ চন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিষ চন্দ্র সরকার, দীনেশ চন্দ্র সরকারের উদ্যোগে করণদীঘি থানার মাদারগাছি গ্রামে ১৯৫৯ সালে মাদারগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়। উদ্যোক্তারাই বিদ্যালয়ের বাড়িঘর নির্মাণের জন্য এক একর একানব্বই শতক জমি দান করেন। পরে আরও তেত্রিশ শতক জমি কেনা হয়। সেখানে দানের জমির উপর পূর্ব দিকে মুখ করে মুলি বাঁশের বেড়া ও টালির ছাউনি দিয়ে তিনটি ঘর তৈরি করা হয়।

প্রশান্ত চক্রবর্তী, সুধীর ঘোষ, বন্ধুলাল সিংহ, ধীরেন্দ্রনাথ দাস এই চারজন ছাত্রকে নিয়ে প্রথম পঞ্চম শ্রেণীর পঠনপাঠন শুরু হয়। তখন হরিমোহন ঘোষ, চারুচন্দ্র দাস, সন্তোষ কুমার সাহা পড়াতেন। পরে পি.আর. নিয়োগী, অজিত ঘোষ, অপূর্ব ঘোষ শিক্ষক পদে যোগ দেন। ১৯৬১ সালে এই বিদ্যালয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর (মেমো নং- ৩৪৩৭/১ (২) জি, ডেটেড-১৯.০১.১৯৬১) পঠনপাঠনের অনুমোদন লাভ করে। ওই বছরে সাড়ম্বরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবর্ষ আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীতের মাধ্যমে পালন করা হয়। সেখানে বিকোরের জ্যোতির্ময় ঘোষের গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়। সুশান্ত চক্রবর্তী কয়েকটি পুরস্কার লাভ করে। আশেপাশের গ্রামের বহু মানুষজন ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। ১৯৬১ সালের ১ মে নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। অজিত ঘোষ ও অপূর্ব ঘোষ বিদ্যালয় ছেলে চলে যান। কারণ তখন তাঁরা কোনো

বেতন পেতেন না।

প্রধান শিক্ষক পি.আর. নিয়োগী ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যান। তারপর ১৯৬২ সালের ১ জানুয়ারি নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষকে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত করা হয়। জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও জয়ন্ত কুমার ঘোষ শিক্ষক হিসেবে এবং সুরেন্দ্রনাথ সিনহা পিয়ন হিসেবে যোগ দেন। তখন পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় একশো পঞ্চাশ জন। ১৯৭০ সালে এই বিদ্যালয় ফোর ক্লাসের (মেমো নং-৯০৫/জে.আর. ডেটেড-১৬.০৬.১৯৭০) অনুমোদন লাভ করে। তারপর সমরেন্দ্রনাথ দাস, কুমুদ রঞ্জন সরকার, মনোজ কুমার সরকার ও বিরাজ কুমার ঘোষ শিক্ষক পদে যোগ দেন। সুশান্ত চক্রবর্তী খুব মেধাবী ছাত্র ছিল এবং অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তিলাভ করে।

পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্তে অষ্টম শ্রেণীর উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে নবম ও দশম শ্রেণীর পঠনপাঠন শুরু করা হয়। তখন ওই দুটি শ্রেণীতে জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষকরাই পাঠ দান করতেন। ১৯৮৪ সালে এই বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয়ে (মেমো নং-এস/৪৮২, ডেটেড-১৩.০৬.৮৪) উন্নীত হয়। দীপেশ চন্দ্র ঘোষ, বিপ্লব দেবনাথ, তৈমুর আলি, অজয় কুমার সিনহা, নির্মল কুমার ঘোষ, আনন্দ কুমার সিনহা প্রমুখ শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ১৯৮৬ সালে চারজন মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় এবং দুইজন পাশ করে। ১৯৯৪ সালে প্রথম সুস্মিতা ঘোষ স্টার মার্কস্ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়।

২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এই বিদ্যালয়কে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর (মেমো নং-ডি.এস.(এ) এস.ডি./ ১৪, রেকগ/০৫, ডেটেড-১০.০৬.২০০৫) কলা বিভাগের অনুমোদন লাভ করে এবং তার সঙ্গে চারজন শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০০৭ সালে এই বিদ্যালয় থেকে প্রথম ত্রিশজন পরীক্ষা দেয় এবং দশ জন পাশ করে। ২০১৭ সালে ১২৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৩ জন পাশ করে। ২০০৭ সালে পরীক্ষায় শতকরা পাশের হার ৩৩.৩৩ জন হলেও ২০১৭ সালে পাশের হার শতকরা ৭৬ জন। এই ফলাফল প্রত্যন্ত এলাকাকে সমৃদ্ধ করে এবং এই প্রতিষ্ঠানকেও গর্বিত করে তোলে।

বিদ্যালয় উন্নয়ন তহবিল, করণদীঘি পঞ্চায়েত সমিতি, সর্ব শিক্ষা মিশন, অনগ্রসর কল্যাণ বিভাগ, সীমান্ত উন্নয়ন তহবিলের আর্থিক অনুদানে চার দিকে দোতলা বাড়ি, পশ্চিমদিকে প্রবেশ পথ, পূর্ব দিকে খেলার মাঠ গড়ে ওঠে। একদা এই মাঠে বি.সি.এম. ফুটবল টিম গড়ে ওঠে। চার দিকের ভবন আর্যভট্ট, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্র এবং বিবেকানন্দ ভবন নামকরণ করা হয়। তিন হাজার গ্রন্থ নিয়ে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। এক সময় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গ্রামবাসীদের যাত্রাগানের চর্চা হতো। ১৯৮৬ সালে বিদ্যালয়ে রজতজয়ন্তী এবং ২০১১ সালে সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হয়। বিভিন্ন সময়ে সুরেশ চন্দ্র ঘোষ, নরেশ চন্দ্র সিংহ, সুখেন্দু চন্দ্র সিংহ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সম্পাদক এবং সুরেশ চন্দ্র সিংহ, আশিষ কুমার সরকার প্রমুখ সভাপতির পদে নির্বাচিত বা মনোনীত হন। সুরেশ চন্দ্র ঘোষ বিদ্যালয়কে দশ হাজার টাকা দান করেন বলে তাঁকে আজীবন দাতা হিসেবে এবং কেদারনাথ ঘোষ ও কালীরঞ্জন সিংহকে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়। শুরু থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সুরেশ চন্দ্র ঘোষ পরিচালন সমিতির সম্পাদক ছিলেন।

বিভিন্ন সময়ে আর.পি.আর. নিয়োগী ও নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রধান শিক্ষকের জে.এন. মণ্ডল ও জয়ন্ত কুমার ঘোষ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের, বসন্ত কুমার পাল ও অজয় কুমার ঘোষ প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন হন। ১৯৬২ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। অজয় কুমার ঘোষ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কে অনার্স নিয়ে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

২০১৯ সালে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১৯ জন, পার্শ্ব শিক্ষক ৪ জন, শিক্ষাকর্মী ৫ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১২৬৩ জন। ছাত্র-ছাত্রীরা মাদারগাছি, বিকৌর, চৌনগড়া কাঁচনা মনিপাড়া, ভুলকী, সাতভেটি, ডাঙ্গি, কাশীবাড়ি, গুলোরপাড়া, কোচড়া, তেলেঙ্গাডাঙ্গী প্রভৃতি এলাকা থেকে আসে। সাতানব্বই শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত। ছাত্রদের পরনে সাদা জামা ও নীল প্যান্ট। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীদের পরনে সাদা জামা ও নীল টিউনিক। সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের পরনে নীল সাদা এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের পরনে নীল পেড়ে সাদা শাড়ি থাকে। অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা করণদীঘি, ডালখোলা ও রায়গঞ্জ থেকে যাতায়াত করেন।

অরূপ কুমার ঘোষ, মহম্মদ সোহেল, মানসী সিন্‌হা, কার্তিক সিনহা ও সুমিতা ঘোষ পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল করে। আন্ত বিদ্যালয় কবাডি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মেয়েরা তিনবার এবং ছেলেরা একবার চ্যাম্পিয়ান হয় এবং শশীভূষণ সিন্‌হা ও মমতা সিন্‌হা জেলা চ্যাম্পিয়ানের শিরোপা লাভ করে। তাছাড়াও দীপালি সিন্‌হা, ফণীভূষণ সিন্‌হা, পাণ্ডব সিন্‌হা প্রথম পুরস্কার পায়।

প্রাক্তন ছাত্র সুশান্ত চক্রবর্তী দেওয়ানহাট মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে, সমরেন্দ্র কুমার ঘোষ এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসকের পদে, অজয় ঘোষ এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে, কল্যাণ ঘোষ, অনুপ কুমার ঘোষ, কৌশিক হিন্‌হা ও সেনাউল হক ইঞ্জিনিয়ার পদে আসীন হন। প্রত্যন্ত এলাকার এই বিদ্যালয় বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে বহু মানুষকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে।

কৃতজ্ঞতী স্বীকার : নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, অজয় কুমার ঘোষ, প্রধান শিক্ষক, প্রশান্ত চক্রবর্তী, প্রাক্তন ছাত্র, মাদারগাছি উচ্চ বিদ্যালয়। ▯

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূল নির্যাস গীতা

অমিত ঘোষ দস্তিদার

বর্তমান দিনে বিশ্বময় অশান্তি। এক দেশ আর এক দেশকে ধ্বংস করার জন্য অকল্পনীয় অর্থব্যয়ে তৈরি করছে বিস্ময়কর ধ্বংসশক্তি সম্পন্ন মারণাস্ত্র। সুস্থ জীবন এবং প্রকৃত সভ্যতার জন্য যথার্থ জ্ঞানের প্রয়োজন। মানব-জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত উচ্চতর। এই উচ্চতর জীবনের উদ্দেশ্যই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে। সকলেই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি— এই চাররকম দুঃখের শিকার। জড় জ্ঞান আমাদের কেবল উন্নত উপায়ে ইন্দ্রিয় ভোগ করতে শেখায়, এছাড়া এই জ্ঞানে আর কিছু শেখাতে পারে না। বিশ্বব্যাপী মানুষ আজ জড় জ্ঞানের দিকে ছুটছে এবং এই জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে শোষণ করে, প্রকৃতির সম্পদকে কেবল ভোগ করতেই শিখেছে। এর ফলে মানব সমাজে ভোগবাদের প্রকোপ বেড়েই চলেছে, দেখা দিচ্ছে অসুস্থ প্রতিযোগিতা, লোভ, অসন্তোষ আর যুদ্ধের হুংকার। কারণ ভোগবাদ নৈতিকতার অবক্ষয়কে রোধ করতে পারছে না। মানুষের জীবনে দিতে পারছে না প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ। গোটা বিশ্বে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ ঘটছে ভাগবৎ-বিমুখ এক আসুরিক সভ্যতা, যা মানুষকে পারমার্থিক সম্পদহীন পশুতে পরিণত করছে।

এখন গোটা বিশ্ব বুঝতে পেরেছে, মানব সভ্যতার যথার্থ উন্নতির জন্য জড় জ্ঞান যথেষ্ট নয়। পরম সত্য, নিত্য, শাশ্বত, সনাতন পারমার্থিক জ্ঞানই জড় জ্ঞানের অভাব পূরণ করতে পারে। একমাত্র ভগবদ্‌গীতাই হচ্ছে সমস্ত পারমার্থিক জ্ঞানের সারস্বরূপ। ভগবদ্‌গীতা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য, এমনকী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীবের কল্যাণের জন্য। বিশ্বের প্রতিটি মানুষ ভগবদ্‌গীতা অধ্যয়ন করে জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে এবং জড়-জাগতিক জীবনের ভয়াবহ অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ও অসুস্থতা থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে লাভ করতে পারে এক প্রকৃত আনন্দময় সুখী জীবন। এই জ্ঞান সমাজে প্রয়োগ করা হলে, মানব-সমাজে ভোগবাদের প্রবল তাড়না ও অবক্ষয়ের বেগ প্রশমিত হয়ে বিশ্বসভ্যতা হতে পারে যথার্থ উন্নত— সংযম, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল।

গীতা জ্ঞানগৃহ। গীতাজ্ঞান আশ্রয় করে পালনকর্তা ত্রিলোক পালনে ব্যস্ত থাকেন। মানবকুলে দৈবিকবার্তা প্রেরণমাধ্যম হলো গীতা। আধ্যাত্মিক জগতের সকল সারতত্ত্বের তথ্য সকল অতি নিপুণভাবে গীতায় পরিবেশিত হয়েছে। গীতার ধর্মই বর্তমান দিনের যুগধর্ম। গীতা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মর্মবাণী। ভারতীয় দর্শনসমূহে মোক্ষলাভের যে পথ নির্দিষ্টরূপে চিত্রিত হয়েছে, গীতা সেই পথের যাবতীয় আপাতবিরোধের সমাধান করে বিভিন্ন রকম দার্শনিক মত ও পথের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছে। গীতা উপনিষদ ও যোগশাস্ত্রের মিশ্রিত নির্যাস। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা। 'যোগঃ কর্মসু কুশলম্' (গীতা-২।৫০)— সার্বিক কর্মকুশলতাই যোগের মূলকথা।

আত্মার অবিনশ্বরত্ব, নিষ্কাম কর্মযোগ এবং পরিপূর্ণ ভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ— এই হলো গীতার মর্মবাণী। গীতা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিবেণী সঙ্গম; যা আজ গোটা বিশ্বে সিঞ্চিত হওয়া খুবই প্রয়োজন।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুখনিঃসৃত বাণীই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। গীতা

অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। গীতায় সাতশত শ্লোকে বিধৃত আছে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব।

মানুষের বুদ্ধি ও বিচার-ক্ষমতা আছে, পশুর নেই। মানব শরীর সব থেকে উন্নত। এমনকী দেবতারাও পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য মানব শরীরের মধ্য দিয়ে আসে। আত্মার নতুন শরীর ধারণ হলো 'জন্ম' এবং পুরনো শরীর ত্যাগ করাই হলো 'মৃত্যু'। এই জন্ম ও মৃত্যু নিয়েই মানব শরীরের অবস্থান।

শাশ্বত জ্ঞান অর্জন করাই মানুষের জীবনের সব থেকে বড়ো উদ্দেশ্য। ভোগ কোনোভাবেই জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। ভোগ থেকে বাড়ে ভোগান্তি। স্বামী বিবেকানন্দ আত্মা সম্পর্কে বলেছেন— 'Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity with by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship, or phychic control, or philosophy– by one or more or all of these and be free.'— অর্থাৎ প্রতিটি আত্মা শাশ্বত ও ঐশ্বরিক, শাশ্বত জ্ঞান ও গুণে ভরপুর। মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোনো কাজ, পুজো, মানসিক নিয়ন্ত্রণ বা দর্শন— এসবের দ্বারা নিজের দেবত্বের বিকাশ ঘটানো ও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাওয়া।

আত্মিক স্থিতিতে থাকলে মন, বুদ্ধি ও সংস্কার নিয়ন্ত্রণে থাকে। মন, বুদ্ধি ও সংস্কার থেকে সত্যের সন্ধান-ইচ্ছা জাগ্রত হয়। মনে রাখতে হবে সত্যের সন্ধান করাই মানুষের প্রধান কাজ। কুকর্ম ও সুকর্মের প্রবৃত্তি মানুষের নৈতিক ভাবের উপর নির্ভর করে। নাস্তিক থেকে আস্তিকে যাওয়াই শ্রেয়। বিজ্ঞানকে সে কথাই বলে। বিজ্ঞানের ভাষায়— আগে দেখ, অনুভব কর, অভিজ্ঞতা নাও, তারপর কোনো কিছুর অস্তিত্বকে বিশ্বাস কর। আগে নিজেকে জানতে হবে, পরে ঈশ্বরকে। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'আমি জানি আমি কে, তাই আমি কৃষ্ণ; তুমি জানো না কে তুমি, তাই তুমি অর্জুন।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে চৈতন্য তা তিনি জানতেন, কিন্তু অর্জুনও যে চৈতন্য তা অর্জুন জানতেন না, সম্পূর্ণ চৈতন্যজ্ঞান অর্জুনের অজানা ছিল। এই চৈতন্য-অচৈতন্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, আত্মা-শরীর ইত্যাদি ভেদাভেদের মধ্যেই নিহিত আছে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় পরম চৈতন্য এক অজ, শাশ্বত, অবিনাশী তত্ত্ব। তাঁকেই আমরা নানা নামে ডাকি।

এই সুবিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বস্তু, শক্তি ও চেতনা— এই তিনপ্রকার তত্ত্ব দিয়ে গঠিত। বস্তুত শক্তি হলো জড় জাগতিক তত্ত্ব। চেতনা হলো চিৎস্বরূপ প্রাণ-চিন্ময়তত্ত্ব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সবই— ব্রহ্ম। সৃষ্টি ও বিলীনের মূল হলো— ব্রহ্ম। আমরা যা দেখি তা হলো ব্রহ্মের পরিবর্তিত রূপ।

আত্মার সৃষ্টি নেই, বিনাশও নেই। অবিনশ্বরতা ও জন্মান্তরবাদের জন্য আত্মা পুরানো শরীর পরিত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে। জড় জগৎ অপরা প্রকৃতি, জীবজগৎ পরাপ্রকৃতি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের মূল কারণ। তিনি অধিভূত, অর্থাৎ অপরা প্রকৃতি। তিনি আবার অধিদৈব, অর্থাৎ পরাপ্রকৃতি। স্বয়ং তিনিই আবার অধিযজ্ঞ। বিশ্বময় পরমচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ বিভূক্ষেত্রজ্ঞ বলেছেন।

ত্যাগ, বৈরাগ্য ও যোগতত্ত্বের মিলনের পরম চৈতন্যই হলো শিবতত্ত্ব। মহাদেব, মহাত্রাণ, মহাযোগী, মহেশ্বর হলেন পরম চৈতন্য। হর ও হরি একই— হরিহর আত্মা। পুরুষ প্রকৃতির মিলিত রূপই শিবলিঙ্গ। প্রকৃতি পুরুষকে আদ্যাশক্তি মহামায়ারূপে জ্ঞাত করেছেন, তাঁরই ভিন্নরূপ সৃষ্টিকারিণী মহাসরস্বতী। পালনকারিণী মহালক্ষ্মী ও ধ্বংসকারিণী মহাকালী। মাতৃশক্তির আরও রূপ আছে। তিনিই দক্ষযজ্ঞের সময় শিবকে দশমহাবিদ্যার রূপ— কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা দর্শন করিয়েছিলেন। ব্রজভূমিতে কৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার জন্য গোপীরা মা কাত্যায়নীর ব্রতপূজা করেছিলেন এবং মা কাত্যায়নীকে সন্তুষ্ট করে পরম পুরুষ, অনাদিরাদি গোবিন্দকে পেয়েছিলেন।

মুক্তির দরজা উন্মুক্ত। মানুষে মানুষে নির্মল স্নেহ— ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি ও সহযোগিতার সূত্রে সমন্বিত হলেই সেখানে উপলব্ধি করা যায় চির আনন্দময় অমৃতের স্বাদ, নেমে আসে স্বর্গীয় সুখ-শান্তির আবহ। মানবদেহই ঈশ্বরের বাসস্থান। ঈশ্বর গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করেন। তিনি গীতাকেই উত্তম গৃহ বলে মানেন এবং গীতাজ্ঞান আশ্রয় করে ত্রিলোক পালন করেন। ঈশ্বর সবসময়ই আমাদের শরীরে অবস্থান করেন। তাই প্রয়োজন শুধু উপলব্ধি ও ঐক্যবোধ। গীতাই একমাত্র আশ্রয় যেখানে মানুষ ও ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে একাকার হয়ে যায়। তাই গীতাই উত্তম গৃহ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রক্ষার্থে এই উত্তম গৃহেই ঐক্যবদ্ধরূপে অবস্থান করতেই হবে। বিশ্ববাসীর জন্য একমাত্র এই উত্তম গৃহই তার প্রাণের দরজা সহজ সরল ভাবে খুলে রেখেছে। ◘

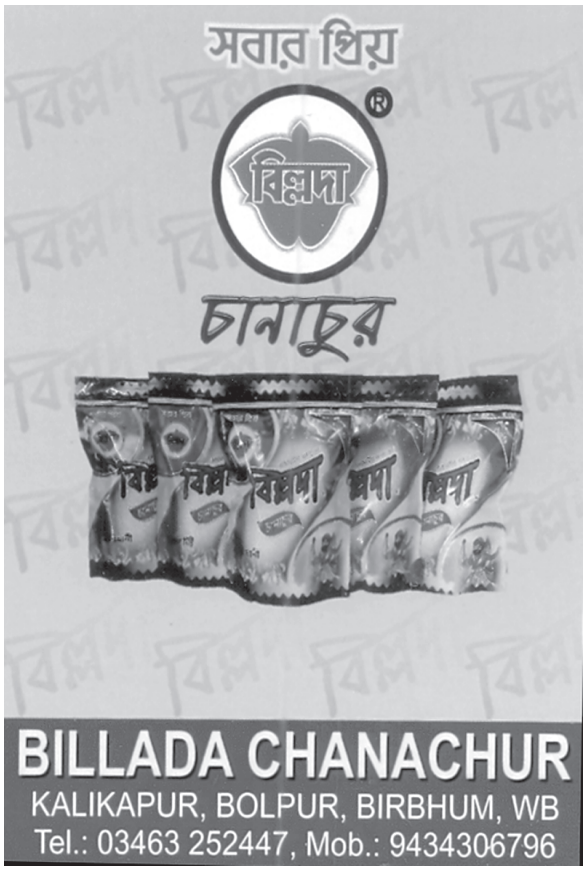

ভোটের বাজারে তৃণমূলের হাতিয়ার শেখ মুজিব এবং দেশি-বিদেশি মৌলবাদীরা

মৌ চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের আবহে কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবে শেখ মুজিবুর রহমান প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে মহান বাঙ্গালি হিসেবে ভোটের বাজারে এনে এক শ্রেণীর বাঙ্গালির মননে নতুন করে আবেগ সঞ্চারিত করতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। এক সময়কার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামি লিগের সম্পাদক শেখ মুজিবের নামে রাতারাতি জয়ধ্বনি উঠছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পৈলান থেকে শিরাকোল হয়ে জয়নগর মজিলপুর, কাকদ্বীপ পর্যন্ত। অপরদিকে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, বীরভূম জেলার কয়েকটি অংশে। এলাকার নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানে মুসলমান জনসংখ্যা বেশি।

ভোটের বাজারে কেবল শেখ মুজিবুর নয়, পাশাপাশি ইসলামিক জলসার আয়োজন করছে রাজ্যের শাসক দল। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে এইসব জলসায় প্রকাশ্যে দেশবিরোধী ভাষণ দিচ্ছে মৌলবাদী মুসলমান মাওলানারা। এই মাওলানাদের অনেকেই পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরান, আফগানিস্তান থেকে আসছে। এই মুসলমানদের কাছে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ বা নেতাজীর গুরুত্ব নেই। তাদের অনেক বেশি ভাবাবেগ আছে জিন্না, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দি, জিয়াউল হক, জাকির নায়েক, আসাদুদ্দিন ওয়াইসির প্রতি। পাকিস্তান খণ্ডিত করার জন্য এবং সমমনোভাবাপন্ন ও একই ভাষার দেশ গঠিত করার জন্য শেখ মুজিবকে ভারতের হিন্দু বাঙ্গালিরা অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে একই কারণে ভারতের কট্টরপন্থী বাংলা ও উর্দুভাষী মুসলমানরা কখনও মুজিবকে পছন্দ করেনি। কলকাতার মুসলমানরা তাঁকে অনেক বেশি মনে রেখেছে এখানকার ইসলামিয়া কলেজের পড়ুয়া এবং নিখিলবঙ্গ মুসলিম লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কট্টরপন্থী যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে। কলকাতার মুসলমানদের এই মনোভাব পরে সংক্রামিত হয়েছে গোটা বাঙ্গলা ও ত্রিপুরায়। কলকাতা ব্রিটিশ পুলিশের গ্যাজেটে লিপিবিদ্ধ আছে, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের নায়ক বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দির উৎসাহে হিন্দু হত্যায় সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন শেখ মুজিব। শোনা যায়, ইসলামিয়া কলেজের অনেক ছাত্র বিশেষ করে বেকার হোস্টেলের কিছু আবাসিক ও পার্ক সার্কাস এলাকার মুসলমান গুন্ডাদের সংগঠিত করে কলকাতার রাস্তায় হিন্দু হত্যায় নেমেছিলেন তিনি। শেখ মুজিবের এই হিন্দু বিরোধিতা দেখে সুরাবর্দি খুশি হয়েছিলেন। তাকে নিজের সহকারী করে নেন সুরাবর্দি। শেখ মুজিবকে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সম্পাদকও করে দেন মুসলমান নেতারা। ১৯৭৪ সালে লাহোরে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক (ওআইসি) কনফারেন্সে ভাষণ দিতে গিয়ে নিজেই এই তথ্য দেন শেখ মুজিব। এই সম্মেলনের ভাষণে তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, গোটা বাঙ্গলাকে একটি ইসলামিক দেশ গঠনের স্বপ্ন তিনি দেখেন, যা তিনি করে উঠতে পারেননি। এইসব তথ্য সবই বিভিন্ন পুস্তকারে আছে যা সহজ লভ্য।

পাশাপাশি ৪৬-এর হিন্দু নরসংহারের ঘটনায় ও ষড়যন্ত্রে মুজিবের সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি বি রমনের লেখা 'এ বেঙ্গলি আব্বাসি লাকিং সামহয়ার' বইটিতে সবিস্তারে লেখা আছে।

উৎসাহী সেকুলাররা দেখে নিতে পারেন। যদিও মুসলমানরা মনে করে মুজিব মুসলমানদের রক্ষা করতেই অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন। মুসলিম লিগ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল কলকাতাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী করা। মুসলমান নেতৃত্ব হিন্দু হত্যার প্রকাশ্য আহ্বান জানিয়েছিল। সেদিন ব্যায়ামবীর গোপাল মুখোপাধ্যায়রা রুখে না দাঁড়ালে এখনকার যাদবপুর, প্রেসিডেন্সির অতি বামেরা এবং তথাকথিত সেকুলাররা কোথায় বিপ্লব করত?

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বিশাল অংশের হিন্দুদের আবেগ চিরকালীন। ব্রিটিশদের সামনে রেখে জওহরলাল নেহরু-জিন্নার গোপন আঁতাতে ভারতবর্ষ ভাগ। তারই ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের অত্যাচারে হিন্দুরক্তে স্নাত, হঠাৎ নেই হয়ে যাওয়া মাতৃভূমি, সব হারিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে এপারে আসা হিন্দু জনপ্লাবন, ধর্ষিতা মা-বোনের জন্য চোখের জলে বুক ভাসানো বাঙ্গালিরা ১৯৭১ সালে হৃদয় দিয়ে শেখ মুজিবুরকে সমর্থন করেছিল। এই পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা আবেগ দিয়ে বুক পেতে দিয়েছিল বলে নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার, বেতার কেন্দ্র সবই হয়েছিল কলকাতায়। বাস্তুচ্যুত এক কোটি মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতে। তাদের বেশিরভাগ ছিলেন হিন্দু। ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় এস এস বি জওয়ানরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা যুদ্ধকৌশল শিখিয়েছেন। এর পাশাপাশি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানকে অপরাধী প্রতিপন্ন করতে ছুটে বেড়িয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী। সেদিন কুটনৈতিক ভাবে ইন্দিরা গান্ধী সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোর ঘোষণা ছিল ভারতের সঙ্গে হাজার বছরের যুদ্ধ হবে। তবে হাজার নয় ৭১-এর যুদ্ধ অল্প দিনেই শেষ হয়েছিল।

শেখ মুজিব বাংলাদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে কলকাতাতেও বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান হয়েছে। নতুন করে অনেকের কাছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ফিরে এসেছে। অনেক তথ্য, ফাইল থেকে পুরনো ছবি বের করে ফের প্রকাশিত হয়েছে। আজকের নেটনির্ভর আত্মসুখী, দিশাহীন হিন্দু প্রজন্মের কাছে অবশ্য সেসবের কোনও গুরুত্ব নেই। তাদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ জেহাদি মুসলমান তরবারির আঘাতে রক্তস্নাত ও ছিন্নমুল।

আজকের প্রজন্ম শেখ মুজিবকে মনে না রাখলেও তৃণমূল কংগ্রেস তাকে ভোটের আবহে রাজনীতির ময়দানে এনে ফেলেছে। অনেকদিন থেকে তৃণমূলের পালে হাওয়া দিচ্ছেন অনাবাসী অর্থনীতির শিক্ষক অমর্ত্য সেন। নিন্দুকেরা বলেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নিজের প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখতে তিনি ঘোর মোদী বিরোধী হয়ে পড়েছেন। শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক হিসেবে অনেকের মতো অমর্ত্য সেনের পিতামহ ক্ষিতিমোহন সেন বসবাসের জন্য বেশ খানিকটা জমি পান। এখন দেখা যাচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেই জায়গার বাইরেও অনেকটাই বেশি জমি নিজের দখলে রেখেছেন। বিশ্বভারতী সঙ্গতভাবে সেই বাড়তি অংশটুকু ফেরত চেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঘোলা জলে মাছ ধরতে ভোটের অমর্ত্য সেনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এর উপর সম্প্রতি অমর্ত্য সেন বিভিন্ন ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান ও মোগল সম্রাট আকবরকে ধর্মনিরপেক্ষতার মহান উদাহরণ ও আদর্শ বলে উল্লেখ করেছেন। অমর্ত্য সেন মনে করেন আকবরের মতো শেখ মুজিবও রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মেশাননি। যা শুনে হয়তো ঢাকার কুট্টির ঘোড়াগুলিও হাসবে। অমর্ত্য সেনের নোবেল খেতাব জয় ভারতকে গর্বিত করতেই পারে, তাই বলে তিনি সুবিধাবাদী রাজনীতির আশ্রয় নিতে পারবেন না এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই জানেন, বাংলাদেশ প্রথমে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। জাতীয় কবি ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। মাত্র এক বছরেই ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি তুলে দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালে ঢাকায় নিষিদ্ধ ইসলামিক অ্যাকাডেমি চালু করেন শেখ মুজিব। তার আগে ওআইসির সদস্য পদ নেন। মুজিবের মৃত্যুর বছরে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সদস্য হয় বাংলাদেশ। একমাত্র ঘোষিত কট্টরপন্থী ইসলামিক দেশগুলি এই ব্যাঙ্কের সদস্য হতে পারে। শেষ দিকে জয় বাংলার বদলে ইনশাল্লা, বিসমিল্লা, খুদা হাফেজ শব্দবন্ধ ব্যবহার করতেন তিনি। ছাত্রজীবনে পালন করা ধর্মীয় বিধি পরের দিকে কঠোরভাবে মেনে চলতেন। শুক্রবার নামাজ আদায় সরকারি ভাবে বাধ্যতামূলক করেছিলেন। তাঁর সময় থেকেই বাংলাদেশে দুর্গা পূজায় সরকারি ছুটি দেওয়া ও হিন্দুদের প্রতি শুভেচ্ছা বার্তার নিয়ম উঠে যায়। সরকারি অনুষ্ঠানে 'জয় বাংলা' বলাও একরকম হতো না। সবই দেশ-বিদেশের কট্টরপন্থীদের খুশি রাখতেই করেছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি অনুষ্ঠানে জয় বাংলা বলা বাধ্যতামূলক। পূজাতে ছুটিও দেওয়া হয়। ফলে অর্মত্য সেন যতই শেখ মুজিবকে ধর্মনিরপেক্ষার প্রতিভূ মনে করুন কেন প্রকৃতপক্ষে তিনি মৌলবাদী মুসলমান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। শাসন ব্যবস্থায় মুজিবই মুসলমান মৌলবাদী ছাপ নিয়ে এসেছিলেন।

শেখ মুজিবের এই মৌলবাদী চরিত্রকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটের বাজারে তুলে ধরতে চাইছেন। অনেকদিন থেকেই জয় বাংলা স্লোগানটি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রচারে এনেছেন। সকলেই বোঝেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত প্রিয় এই স্লোগানটির প্রেক্ষাপট অনেক বড়ো। হয়তো বৃহত্তর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের স্বপ্ন দেখেন, তাই শেখ

মুজিবের প্রায় বাতিল করা স্লোগান তৃণমূল নেত্রীর এখন ভোট উত্তরণের অন্যতম হাতিয়ার।

ইসলামি মৌলবাদীদের ঘোষিত কর্মসূচি হলো পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে বৃহত্তর ইসলামিক দেশ গঠন। সেই লক্ষ্যে সাংগঠনিক প্রস্তুতি চলছে বহুদিন থেকে। সকলেই বোঝেন কংগ্রেস, বাম এবং এখন তৃণমূল কংগ্রেস ভোটের জন্য মুসলমান তোষণ প্রথম থেকেই করে আসছে। এই মুসলমান তোষণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষরিক অর্থেই শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। গোটা রাজ্য এখন মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয়। বর্তমান রাজ্য সরকারের প্রশ্রয়ে দিনে দিনে এই রাজ্যে জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। কেবল বাংলাদেশ নয় মায়ানমার, পাকিস্তান আফগানিস্তানের সন্ত্রাসবাদীরা এখানে আশ্রয় নিচ্ছে।

ভোটের দিন এগিয়ে আসতেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম জেলার বিভিন্ন অংশে শেখ মুজিবের ছবি-সহ ইসলামিক জলসার আয়োজন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে তৃণমূল কংগ্রেস। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সারারাত ধরে চলা এই কর্মসূচিগুলিতে শেখ মুজিবের ইসলামিয়া কলেজের দিনগুলির কথা বেশি আলোচনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি উল্লেখ করা হচ্ছে মুজিব হত্যাকারী জিয়াউর রহমান, মেজর ডালিম, এরশাদের ভূমিকার। জিয়া, এরশাদ অনেক বেশি কট্টরপন্থী মনোভাবসম্পন্ন ছিল এমন কথাও তোলা হচ্ছে। রাজ্যের শাসক দলের উদ্যোগে আয়োজিত শেখ মুজিব স্মরণে ইসলামিক জলসায় দেখা যাচ্ছে ঢাকা, ইসলামাবাদ, করাচী, তেহেরান থেকেও মৌলবাদী ধর্মগুরুরা আসছে। এইসব জলসায় চাঁদ-তারা সংবলিত সাদাকালো ডোরাকাটা পতাকার নীচে ইসলামি রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে তৃণমূল নেত্রীর ছবি। সেই ছবিতে আবার ফুল মালা। তৃণমূলকে ভোটদানের ফতোয়া দেওয়ার পাশাপাশি পাকিস্তান, তুরস্ক, লেবানন ও আরবের স্তুতি করা হচ্ছে। সংগঠিত ভাবে এইসব জলসায় মুসলমানদের আসতে বাধ্য করছে শাসক দলের মৌলবাদী নেতারা। অভিযোগ, তৃণমূলের এই নেতারা পাশাপাশি বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী ও মৌলবাদী সংগঠনের সক্রিয় সমর্থক ও সদস্য। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে চলতি মাসের ১৭ তারিখ মুর্শিদাবাদের সেলামতপুরে এবং সীমান্ত লাগোয়া কাজীনগর শেখপাড়ায় তৃণমূলের উদ্যোগে শেখ মুজিব স্মরণে দুটি জলসা অনুষ্ঠিত হয়। দুটি জলসাতেই ভারত বিরোধী ভাষণ ও স্লোগান দেওয়া হয়। জলসা স্থলের বাইরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক ধরনের ছবি ছিল। ঢাকা থেকে আসা মৌলনা হাফিজুল সিদ্দিকি মুসলমানদের অস্ত্র হাতে নেওয়ার আহ্বান জানায়। এই দুটি জলসাতেই মুম্বই থেকে আসা জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত জামিনে থাকা খুরশিদ আলম খান এবং সফারত নওয়াজ আলি মুর্শেদ উপস্থিত ছিল। গোয়েন্দাদের মতে, আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রচারের আড়ালে মুসলমান মৌলবাদীদের নিজস্ব অ্যাজেন্ডা চলছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে দেশ বিরোধী প্রচারের বিষয়টি রাজ্য প্রশাসনের অজানা নয়। কিন্তু পুলিশ, রাজ্য গোয়েন্দা বা প্রশাসনিক কর্তারা একটি নিয়ম মাফিক রিপোর্ট পেশ করেই দায় সারেন। তবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর নজরে সবটাই আছে।

ভোট প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত শেখ মুজিব ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান কর্মসূচিতে প্রাথমিক ভাবে খুব বেশি সাড়া পড়েনি। কিন্তু এর সঙ্গে ইসলামিক ভাষণ, কাওয়ালি এবং পাকিস্তান, ইরান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মোল্লা, মৌলবিরা যুক্ত হওয়ার পর ভালো সাড়া পড়েছে। গদির লোভে দেশের মাটিকে বিকিয়ে দেওয়ার আয়োজন করছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল ক্ষমতায় ফিরলে আগামীদিনে ভয়াবহ রূপ নেবে এমনটাই আশঙ্কা সকলের। □

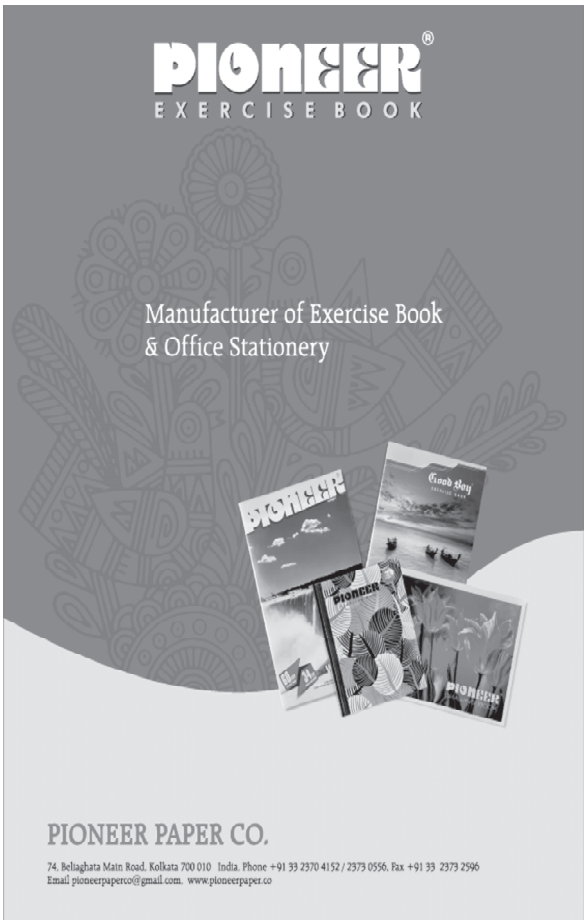

ঝুনু পাগলের গলি

নিলয় সামন্ত

যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল স্বস্তিকা দপ্তর। কিন্তু সব কিছু তো আর নিজের ইচ্ছেয় হয় না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল বর্ষীয়ান ক্রীড়া সাংবাদিক নির্মল কুমার সাহার একটা ফেসবুক পোস্ট। হেদুয়ার কাছাকাছি অলিগলি পেরিয়ে ভৈরব বিশ্বাস লেন দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমনিতে ওই ছোটো রাস্তার কোনও গুরুত্ব সাধারণ মানুষের কাছে আছে বলে মনে হয় না। ওই রাস্তা সম্পর্কে নির্মলদা বর্ণনা করেছেন, 'ভৈরব বিশ্বাস লেন আমার মনে গেঁথে রয়েছে সিকি শতাব্দী ধরে। গত ২৫ বছর যতবার ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছি, আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে একটি ছবি। এক সময় উত্তর কলকাতার অলিগলিতে যাঁর পরিচয় ছিল 'ঝুনু পাগল'! কিন্তু ওটাই কি ওঁর আসল পরিচয়'?

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। সেই সময়ই বাঙ্গলার নামি ডাইভার কমল ভট্টাচার্য। ভৈরব বিশ্বাস লেনেই ছিল কমলদের বাড়ি। ওই পাড়ায় পৌঁছে নির্মলদার পোস্টটার কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল কমলের কথা। সাতের দশকের শেষ থেকে আটের দশকের ঠিক শুরু, হাইবোর্ড ডাইভিংয়ে তখন বাঙ্গলার উজ্জ্বল তারকা কমল। টানা রাজ্য চ্যাম্পিয়ন। ডাইভিংয়ের সাফল্যের জন্যই পেয়েছিলেন ইস্টার্ন রেলের চাকরি। প্রথমে বাঙ্গলা, পরে রেলের হয়ে অংশ নিয়েছেন জাতীয় প্রতিযোগিতায়। এক সময় সফল ডাইভার কমলকে নিয়ে প্রতিবেদন বেরিয়েছে নামি দৈনিকে।

কীভাবে স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান কমল? ডাইভিংয়ে অনেক সাফল্য পেলেও গত শতাব্দীর আটের দশকের গোড়া থেকে কমলের জীবনের গতিপথ ঘুরতে থাকে। অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরে নানারকমের নেশা। সেই নেশার জগৎ থেকে বের করে আনতে একটু কম বয়সেই, ১৯৮২-র ৯ মে বাড়ির লোকেরা কমলের বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু ১৯৮৪ সালে কমলদের পরিবারে পরপর দুটি বিপর্যয় ঘটে যায়। ওঁর মেজো ভাই কমলেশ ছিলেন ওয়াটারপোলো খেলোয়াড়। তিনি ক্যান্সারে মারা যান। সেই শোক কাটতে না কাটতেই আরও বড়ো ধাক্কা। জন্মের ঠিক পরেই মারা যায় কমলের পুত্র। ১৯৮৫-তে কমলকে ছেড়ে স্ত্রীও চলে যান বাপের বাড়ি। পরপর এত শোক কমল আর সামলাতে পারেননি। জলের টান, রেলের চাকরি, সংসারের মোহ— সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন উন্মাদ। ওঁর বাবা সুশীল ভট্টাচার্য ও মা নীলিমা ভট্টাচার্য যতদিন বেঁচে ছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন ছেলেকে সুস্থ করে তুলতে। কিন্তু পারেননি অর্থের টানাটানিতে। আমি যখন 'উন্মাদ' কমলকে প্রথম দেখি, তখন অবশ্য ওঁর বাবা-মা দুজনই প্রয়াত। মা-বাবার মৃত্যুর পর দাদাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন ওঁর ছোটো ভাই গণেশও। লাভ হয়নি।

সঙ্গের ছবিটা একঝলক দেখলেই বোঝা যাবে, ছবিটা কোনও এক উন্মাদের। 'ঝুনু পাগল'-এর ছবিটার মতো ডাইভিং বোর্ড থেকে কমলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্যগুলোও চোখের সামনে এখনও ভাসে নির্মলদার। আসলে সেই কমলই পরবর্তী সময়ে উত্তর কলকাতার একাংশে পরিচিত ছিলেন 'ঝুনু পাগল' নামে। পরে নির্মলদাকে লিখতে হয়েছে 'উন্মাদ' কমলকেও নিয়েও।

এখন থেকে ২৫ বছর আগে ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে নির্মলদার দৈনিক পত্রিকা দপ্তরের এক সহকর্মী সুশান্ত বিশ্বাসের কাছ থেকে প্রথম নির্মলদা জানতে পারেন যে, কমল উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। রাস্তাতেই কাটে রাত-দিন। এক দুপুরে তিনি যান উত্তর কলকাতার রাস্তায় ওঁকে খুঁজতে। প্রথমে কমলের পাড়ায়। সেখানে পাওয়া গেল না। তবে পাড়ার লোকেরা নির্মলদাকে জানালেন, হেদুয়া থেকে শোভাবাজারের মধ্যেই কমল বেশি ঘোরাফেরা করেন। আর যত রাতই হোক, পাড়ায় ফিরবেনই। ওঁদের কথামতো হেদুয়া থেকে শোভাবাজার, অনেক অলিগলি খুঁজেও নির্মলদা দেখা পাননি কমলের। অবশেষে রাত দশটার পর আবার যখন তিনি যান ভৈরব বিশ্বাস লেনে। তখন সন্ধান পান কমলের। সরু গলিতে যে বাড়িতে একসময় থাকতেন, তার দেওয়াল ঘেঁষেই শুয়েছিলেন। নির্মলদার এখনও মনে আছে, ওর পরনে ছিল প্রায় পুরোটাই তাপ্পি দেওয়া ফুল প্যান্ট আর শার্ট, নোংরায় যার আসল রং হারিয়ে গিয়েছিল। শোয়া অবস্থাতেও দু-পায়ে ছিল দু-রঙের হাওয়াই চপ্পল। পাড়ার লোকদের কাছ থেকেই নির্মলদা জেনেছিলেন, পুরো দিন যেখানেই কাটুক, প্রতি রাতে বাড়ির লাগোয়া ওই দেওয়াল ঘেঁষেই শুয়ে থাকেন। হয়তো শিকড়ের টানেই কখনও এর ব্যতিক্রম হয় না।

১৯৯৬-এর এপ্রিলের পর যখন ওই পাড়ায় নির্মলদা গিয়েছেন, কমলের খোঁজ করেছেন। কয়েকবার কমলকে দেখেওছেন। এভাবেই চলছিল। কয়েক বছর পর একদিন ওই পাড়ায় গিয়ে কমলের খোঁজ করতেই এক কিশোর জানিয়েছিল, 'ঝুনু পাগল মরে গেছে'। মৃত্যুর পরও পাড়ার অনেকের কাছেই কমলের পরিচয় সেই 'ঝুনু পাগল'! বিস্ময়ের হলেও এটাই সত্যি, ওঁদের কাছে অজানা থেকে গিয়েছে 'ঝুনু পাগল'-এর আসল পরিচয়। নির্মল কুমার সাহা না জানালে আমার কাছেও অজানা থেকে যেতো এই করুণ কাহিনি। □

তারকা হয়েও ওরা ছিলেন পাশের বাড়ির লোক

ধীরাজ ভট্টাচার্য

রূপশ্রী দত্ত

বাংলা ছবিতে একাধারে খলনায়ক আবার অন্যদিকে সুলেখক বলতে দুজন অভিনেতার নামই মনে আসে। প্রথমজন, ধীরাজ ভট্টাচার্য ও দ্বিতীয়জন বিকাশ রায়।

ধীরাজ ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯০৫ সালে ও মৃত্যু ১৯৫৯ সালে। তিনি নির্বাক যুগ থকে অভিনয় আরম্ভ করেন। যশোহর জেলার পাঞ্জিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ললিতমোহন ভট্টাচার্য। মিত্র ইনস্টিটিউটশন থেকে পাশ করে ধীরাজ আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পড়াশোনা সম্পূর্ণ করার আগেই পুলিশ সার্ভিসে যোগ দেন। তারপর অভিনয় জীবন।

প্রথমে তিনি ম্যাডান থিয়েটার মঞ্চে যোগদান করেন। তাঁর অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র 'সতীলক্ষ্মী'। পরবর্তীকালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ডিটেকটিভ ও গোয়েন্দা ছবিতে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা ও স্বীকৃতি পান। প্রথম বাংলা হরর ফিল্ম 'কঙ্কাল'-এ তিনি অভিনয় করেন। ভৌতিক ছবি গোয়েন্দা বা ডিটেকটিভ ছবির থেকে পৃথক। ধীরাজ ভট্টাচার্যের প্রতিটি ছবিতে তাঁর খলনায়ক বা ভিলেনের ভূমিকা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁকে পর্দায় দেখা গেলেই দর্শক বুঝত, এবার কুটিলতার অবতারণা ঘটবে। তৎকালীন বয়োজ্যেষ্ঠ দর্শকরা তাঁর সংলাপ ও বাচনভঙ্গী অনুকরণ করতেন।

প্রথম বাংলা হরর ফিল্ম 'কঙ্কাল'-এর পরিচালক ছিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র। ধীরাজ ভট্টাচার্য চলচ্চিত্র বিষয়ক বেশ কিছু পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছিলেন। দুটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। একটির নাম 'যখন পুলিশ ছিলাম' ও আরেকটির নাম 'যখন নায়ক ছিলাম।'

এই পর্যায়ের দ্বিতীয় অভিনেতা হলেন

বিকাশ রায়

বিকাশ রায়। পিতার নাম যুগলকিশোর রায়। আদি নিবাস নদীয়ার মদনপুর গ্রামের প্রিয়নগর অঞ্চলে। মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৩২ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন ১৯৩৬ সালে। রেডিয়ো-র ঘোষক ও পরবর্তীকালে বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি নিয়েছিলেন। তাঁর অভিনয় জীবন দীর্ঘ ৩৮ বছরের। মঞ্চেও যোগ দিয়েছিলেন। অভিনীত ছবি— 'টাকা আনা পাই', 'না', '৪২', 'রত্নদীপ', 'জিঘাংসা', 'আরোগ্যনিকেতন'। খলনায়ক বা ভিলেন হিসেবেও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাচনভঙ্গী, কণ্ঠস্বর ও অনবদ্য স্টাইল ছিল তাঁর। এছাড়াও তিনি পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন অনেক বাংলা ছবি।

তাঁর রচিত গ্রন্থ— 'মনে পড়ে', 'কিছু ছবি, কিছু গল্প' 'প্রসঙ্গ' 'অভিনয়' ও 'আমি'। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় কলেজ ম্যাগাজিনে লিখতেন। এছাড়া 'বেদুইন' নামে এক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এইভাবে অভিনয়ের নানা বিচিত্র আঙ্গিক ও সাহিত্যপ্রীতি— এই দুইয়ের সংমিশ্রণে এই দুজন অভিনেতা সংস্কৃতির অঙ্গনে বিচরণ করে গেছেন।

বিকাশ রায়ের আরেকটি গুণ ছিল। গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে 'দীপালী' নামে এক চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তাতে চলচ্চিত্র জগতের সুপ্রতিষ্ঠিত নায়ক নায়িকারা পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাতেই পাঠক-পাঠিকাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তখনও উত্তমকুমার সেভাবে জনমানসে অধিষ্ঠিত হননি। অপরপক্ষে, বিকাশ রায় নায়ক ও খলনায়ক হিসেবে অসাধারণ জনপ্রিয়। পাঠক-পাঠিকাদের রসিকতার প্রশ্নের উত্তরে তিনিও চোখা চোখা জবাব দিতেন। পাঠক-পাঠিকারা অভিভূত হতেন এই 'মুখের মতো জবাব'-এ। এভাবেই তাঁরা মানুষের কাছ থেকে দূরে না সরে গিয়ে কাছে চলে আসতেন। □

ঋষি

সে অনেকদিন আগেকার কথা। ভারতবর্ষের আকাশ তখন ছিল ঘন নীল। এখনকার মতো তাতে লাগেনি বিবর্ণতার ছোঁয়া। বৃক্ষরাজি ছিল আরও সবুজ। ফুলগুলি ছিল উজ্জ্বল ও বর্ণময়। যতদূর চোখ যায় বনভূমির প্রাচীন বনস্পতিগুলি দীর্ঘ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে ছুঁতে চাইত আকাশ।

সেই শান্ত গম্ভীর আরণ্যক পরিবেশে বাস করতেন শ্মশ্রু-গুম্ফ শোভিত একদল শান্ত মানুষ। তাদের বলা হতো ঋষি। তারা বনের মধ্যে কুটির নির্মাণ করে জ্ঞান সাধনায় মগ্ন থাকতেন। সেই বনে থাকত নানারকমের হিংস্র জন্তুজানোয়ার। তারা কিন্তু ঋষিদের ক্ষতি করত না। ঋষিরা সবাইকে ভালোবাসতেন । তাঁরা স্নেহভরে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। কুটির চত্বরে হিংস্র জন্তুজানোয়ার গৃহপালিত পশু-পক্ষীর মতো বিচরণ করত।

ঋষিদের কুটির ঘিরে চারপাশের অজস্র ফল-ফুলে ভরা বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী মিলে যে শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠত তাকে বলা হতো তপোবন। ঋষিরা জগতের মঙ্গল কামনায় সেখানে সাধনা করতেন। তপাবনের বাইরের দূরদূরান্তের লোকালয়ের বিদ্যার্থীরা এসে একাদিক্রমে বারো বছর আশ্রমে থেকে পড়াশোনা করে ফিরে যেত।

খুব ভোরে পাখিরা গান গেয়ে ঋষিদের ঘুম ভাঙিয়ে দিত। তারপর নদীতে স্নান সেরে হাত জোড় করে পূর্ব আকাশের দিকে তাকাতেন। আকাশের তারাগুলো তখন একে একে নিভে যাচ্ছে। মৃদু শীতল হাওয়া বইছে। বুক ভরে নেওয়া সেই নির্মল বাতাসে শরীর-মন-প্রাণ জুড়িয়ে যেত। আকাশে লাল আবির ছিটিয়ে নরম বলের মতো সূর্য ধীরে ধীরে দিগন্তরেখার কোল ঘেঁসে উপরের দিকে উঠে আসত। ঋষিরা তখন হাত জোড় করে সূর্যদেবের স্তব করতেন। তারপর সেই সুন্দর ভোরে বিদ্যার্থীদের পাঠদানে মগ্ন হতেন। বিদ্যার্থীদের সামগানে বনভূমি মুখর হয়ে উঠত।

গভীর রাতে ঋষিরা নির্জনে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে তপস্যায় মগ্ন হতেন। নিজের মনকে একটি কেন্দ্রে স্থির করতেন। আমরা ঘুমিয়ে পড়ার মুহূর্তে যেমন বাইরের জগৎ ক্রমশ দূরে সরে যায়, সেরকম ভাবেই ঋষিরা বাইরের জগৎ থেকে মনকে সরিয়ে আনতেন। সেই সময় তাঁদের বাইরের সব অনুভূতি মিলিয়ে যেত। স্তব্ধ হয়ে যেত মনের ছোটাছুটি। অদ্ভুত নৈঃশব্দের মধ্যে তাঁদের হৃদয়ে উৎসারিত হতো এক প্রলম্বিত ধ্বনি—অ- উ -ম.....। এই ধ্বনির সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে তাঁদের অস্তিত্ব। ওই ধ্বনির সঙ্গে ক্রমশ তাঁরা ডুবে যেতেন অন্তর্লোকের গভীরে। তখন জেগে উঠত নতুন এক জগৎ– তার নাম অন্তর্জগৎ। এই অন্তর্জগৎ থেকে তাঁরা আহরণ করে আনতেন জ্ঞান। সেই জানভাণ্ডার নিয়েই পরবর্তীকালে জন্ম নিল ভারতের জীবনদর্শন। তা ক্রমে ক্রমে বেদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

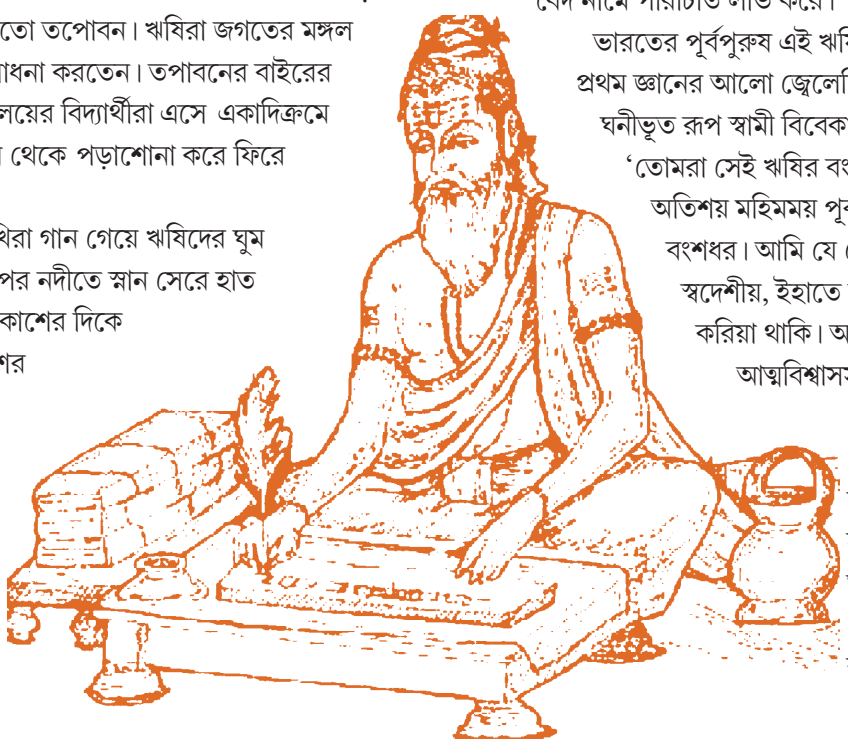

ভারতের পূর্বপুরুষ এই ঋষিগণ সারা বিশ্বে প্রথম জ্ঞানের আলো জ্বেলেছিলেন। ভারতের ঘনীভূত রূপ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—‘তোমরা সেই ঋষির বংশধর। সেই অতিশয় মহিমময় পূর্বপুরুষগণের বংশধর। আমি যে তোমাদের স্বদেশীয়, ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। অতএব তোমরা আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হও। তোমাদের পূর্বপুরুষগণের নামে লজ্জিত হইয়ো না তাঁহাদের নামে গৌরব অনুভব কর।’

তাপস ঘোষ

ভারতের পথে পথে

শ্রীনগর

জম্মু-কাশ্মীরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শ্রীনগর। ডাল লেক ও ঝিলাম শ্রীনগরের দুই হৃৎপিণ্ড। ১৭৬৮ মিটার উচ্চতায় ৩৭.৮ বর্গকিলোমিটার উপত্যকা জুড়ে লেক ও বাগিচায় সুশোভিত অতি আধুনিক শহর শ্রীনগর। অপরূপ সৌন্দর্যের জন্যই নাম হয় শ্রীনগর। অন্যমতে সূর্যনগর থেকেই শ্রীনগর। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে ডাল লেক, নেহরু পার্ক, চারমিনার, কবুতরখানা, হরি পর্বত, হরওয়ান, গাগরিবাল পার্ক, চশমাশাহি, নিশাত বাগ, শালিমার বাগ, নাসিম বাগ ও শঙ্করাচার্য মন্দির। মন্দিরটি শহর থেকে ৩০৫ মিটার উচ্চতায় পাহাড় ঢালে অবস্থিত। আট বছর বয়সে আদি শঙ্করাচার্য ভারত পর্যটনে বেরিয়ে কাশ্মীরে আসেন এবং তপস্যায় বসেন এই পর্বত ঢালে। সেই থেকে এই পর্বতের নাম হয় শঙ্করাচার্য পাহাড়। পাহাড় থেকে শ্রীনগর শহর তথা পুরো কাশ্মীর উপত্যকা সুন্দর দৃশ্যমান। এখান থেকে তুষারাচ্ছাদিত পিরপাঞ্জাল শৃঙ্গের দৃশ্য মনোরম।

জানো কি?

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতীক

- ভারত– অশোক স্তম্ভ
- পাকিস্তান– চাঁদ-তারা
- বাংলাদেশ— শালুক ফুল
- আফগানিস্তান– মসজিদ
- বেলজিয়াম– সিংহ
- ইরান–গোলাপ • ফিনল্যান্ড– সিংহ
- শ্রীলঙ্কা–সিংহ • ডেনমার্ক – রাজহাঁস
- অস্ট্রেলিয়া– ক্যাঙারু
- মায়নমার–রূপকথার সিংহ
- চীন– ড্রাগন • ভুটান–হিংস্র ড্রাগন
- কম্বোডিয়া–অঙ্কোরভাট মন্দির
- ইন্দোনেশিয়া– গরুড় পক্ষী

ভালো কথা

এক হাতেই কাজ

আমাদর পাড়ার সুধীরদাদুর জন্ম থেকেই বাঁ হতেটি নেই। তা সত্ত্বেও সব কাজ করতে পারেন। ওরা খুব গরিব। অন্যের বাড়িতে মজুর খেটে দিনাতিপাত করেন। খুব হাসি খুশি থাকেন সব সময়। কোনো কাজে ফাঁকি দেন না। কারো সঙ্গে ঝগড়া করেন না। সবাই তাকে ভালোবাসে। তিনি নিজেকে হ্যান্ডিক্র্যাপ বলেন না। কেউ বললে বলেন আমার তো শক্ত সবল একটা হাত ও দুটো পা ভগবান দিয়েছেন। আমি তো সব কাজ করতে পারি। সত্যিই তো সুধীরদাদু এক হাতেই কোদাল চালাত পারেন। জমির সব কাজ করতে পারেন। কে যেন সরকারি সাহায্য পাইয়ে দেবার কথা বলেছিল। সুধীরদাদু তাকে নাকি বলেছেন, এখন দরকার নেই, যখন কাজ করতে পারব না তখন দরকার।

রামকৃষ্ণ সরকার, একাদশ শ্রেণী, ধরমপুর, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ণ না প্রা শ	(১) দা ন শো ন্দ য ন
(২) ল কৌ শ যু	(২) কা হি ণি লো ত ক

১৫ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) ঘৃতকুমারী (২) ছেলেছোকরা

১৫ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) বংশমর্যাদা (২) মাঝবয়সি

উত্তরদাতার নাম

(১) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল-৪৯। (২) মৃন্ময় সরকার, গাজোল, মালদা। (৩) প্রীতিকণা দেবনাথ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। (৪) নিয়তি নাথ, বসিরহাট, উ: ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

বারুইপুরে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে হিন্দু সম্মেলন

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে গত ১৪ মার্চ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর থানার সূর্যপুর স্টেশন সংলগ্ন মাঠে এক বিরাট হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক তাপস বারিক, সহ সম্পর্ক প্রমুখ সঞ্জয় শাস্ত্রী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ প্রচারক অর্জুন মণ্ডল, ক্রীড়া ভারতীর রাজ্য কমিটির সদস্যা শ্রীমতী জয়ন্তী মণ্ডল সরকার। বক্তারা সবাই তাঁদের বক্তব্যে বলেন, 'যেভাবে মৌলবাদী জেহাদি কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে, তাতে আগামীদিনে হিন্দুদের আবার ঘরছাড়া হতে হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ-প্রশাসন নির্বিকার ও নিশ্চুপ। এমতাবস্থায় হিন্দুদের সংগঠিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।' বক্তারা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হিন্দুত্বপ্রেমী দলকে সরকারে অধিষ্ঠিত করার আবেদন জানান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের জেলা সহ সম্পাদক সঞ্জয় মোদক এবং ধন্যবাদ জানান সঞ্জয় শাস্ত্রী।

দুই জেলায় গো গ্রাম কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ শিবির

গত ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলায় গো গ্রাম কার্যকর্তা

প্রশিক্ষণ শিবিরের অয়োজন করা হয়। শিবিরে দুই জেলার ৫২ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষিত কৃষকরা গো-নির্ভর কৃষিতে উৎসাহিত হয়ে সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে চাষ করছেন। কৃষকরা নিজেদের সুস্থতার জন্য গোরুর সূত্র থেকে তৈরি ওষুধ সেবন করছেন। তাঁরা গোময় ভস্ম দ্বারা দাঁতের মাজন, বাসন মাজার সাবান, মুখশ্রী চূর্ণ (ফেস ওয়াশ), দেহশ্রী চূর্ণ (বডি ওয়াশ) এবং গোময় দ্বারা পূজার ধূপ ও মশা তাড়ানো ধূপ তৈরি করে লাভান্বিত হচ্ছেন। এর ফলে তাঁদের জীবনযাত্রার ব্যয় কমেছে এবং গোপালনের আগ্রহ বেড়েছে।

গো সেবা গতিবিধি পরিচালিত প্রশিক্ষণ বর্গে প্রশিক্ষিত হয়ে বর্ধমান ও হুগলী জেলার চাষিরা সম্পূর্ণ জৈবসারে আলু চাষ করেছেন। ব্যয়বহুল রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে অতি সামান্য খরচে আলুচাষে তাঁরা লাভবান হয়েছেন।

মুরারীপুর শাখায় বীর প্রশান্ত মণ্ডলের বলিদান দিবস উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের মতো এবারও গত ১৬ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুরারীপুর শাখায় বীর প্রশান্ত মণ্ডলের বলিদান দিবস উদ্‌যাপিত হয়। জেলার বিভিন্ন শাখা থেকে স্বয়ংসেবকরা

এই স্মরণসভায় উপস্থিত হন। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পরিবার প্রবোধন প্রমুখ মটুকশ্বর পাল, উত্তরবঙ্গ বিদ্যা ভারতীর সংগঠন সম্পাদক পার্থ ঘোষ ও উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ প্রদীপ সাহা।

মাননীয়া এখন খড়কুটো ধরে বাঁচতে চাইছেন

জাহ্নবী রায়

এখন হুইল চেয়ারে বসে মাননীয়া প্রতিটি জনসভায় যাচ্ছেন। নিজের চোট খাওয়া পা-টাকে এক্সজিবিট হিসেবে রেখে প্রচার করছেন। সঙ্গে রাখছেন কিছু পেইন কিলার। মোদ্দা কথায় একটা সহানুভূতির আবরণে নিজেকে মুড়ে ভোট সাগরের বৈতরণী পার করছি।

মাসটা ছিল ২০২০-র ডিসেম্বর। তারিখটা ছিল ১০। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা যাচ্ছিলেন ডায়মন্ডহারবারে একটি রাজনৈতিক সভায়। সঙ্গে ছিলেন কৈলাশ বিজয়বর্গীয় সমেত বহু রাজ্য ও সর্ব ভারতীয় নেতৃত্ব। সেই কনভয়

হতে চাইছেন। তিনি প্রতিটি জনসভায় গিয়ে বলছেন বিজেপির ষড়যন্ত্র করে হামলার কথা। আদতে তিনি নিজেই দুর্ঘটনা তত্ত্ব হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে বলেছেন। এমনকী নির্বাচন কমিশনের কাছে রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনার তত্ত্বকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছিল, ফলে যে ষড়যন্ত্রের কথা মাননীয়া ফলাও করে বলছেন প্রতিটি জনসভায়, সেটি যে সর্বৈব মিথ্যা সেটা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। যাই হোক, বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব বারে বারে আক্রান্ত হয়েছেন সেটা কি মাননীয়া ভুলে গেলেন। একটু মনে করিয়ে দেওয়া দরকার আছে বলে শিরাকোলের কাছে আসতেই তৃণমূল সমর্থকদের হামলার মুখে পড়তে হয়। কৈলাশ বিজয়বর্গীদের গাড়িতে পাথর পড়লে তিনি হাতে চোট পান। এমনকী হাতে একটা হেয়ার ক্র্যাক ধরা পড়ে। সেই অবস্থাতেই তিনি সভায় যান। কিন্তু ব্যথায় কাতর হলেও সেই ব্যথা চেপে রেখে তিনি হাসি মুখে সভা শেষ করেন। তারপরেও তিনি কোনোদিন তাঁর চোট পাওয়া হাতকে সামনে এনে সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করেননি।

আসি দ্বিতীয় ঘটনায়। দিলীপ ঘোষের কনভয় জামালপুরের জৌগ্রাম হয়ে সাহাপুরে সভাস্থলের দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় জৌগ্রামের আমড়া মোড়ের কাছে এলাকার কিছু লোক বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে কালো পতাকা দেখায়। শুধু তাই নয়, সেই কনভয়ে হামলা চালায় তৃণমূল সমর্থকরা।

মাননীয়া হয়তো ভুলে গেছেন ২০১৯-এর ঘটনা। নির্বাচনের দিন। সেদিন আক্রান্ত হয়েছিলেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। সেদিন মাননীয়া বিজেপির অভিযোগের তির কিন্তু ছিল আপনার দল ও আপনার পুলিশের ওপর। তিনি আঘাত পেলেও আপনার মতো নির্লজ্জ হয়ে আঘাত দেখিয়ে সহানুভূতি চাননি।

আর আপনি, প্রতিদিন নানা অছিলায়, (আপনার আঘাত কতটা গুরুতর সেই প্রসঙ্গে নাই-বা যাওয়া গেল। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন এটাই চাই সবাই) এভাবে আঘাত পাওয়া পা'টিকে দেখিয়ে সহানুভূতি আদায়ের ক্ষেত্রে আপনি বোধহয় একজন রাজনীতিক হিসেবে অগ্রগণ্য হয়ে উঠলেন। জানি আপনার এখন বলার কিছুই নেই। আপনি আপনার পরিবারের অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের জন্য মরণপণ করে শেষ বারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে বিজেপি ঝড়ে ভেসে যাবার আগে খড়কুটো ধরে বাঁচতে চাইছেন।

সবশেষে আপনাকে নিয়ে নেটিজেনদের কিছু ব্যঙ্গাত্মক কথা বলা যাক তাঁরা চাইছেন আপনাকে কষ্ট করে ওভাবে শাড়ি তুলে পা না দেখিয়ে, একটা সাদা বারমুডা জাতীয় কিছু পরে, পা-টিকে উন্মুক্ত রাখুন। তাতে আপনাকে হুইল চেয়ারে বসে পা তুলে আর জনগণকে লাথি দেখাতে হবে না। স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো, আপনার দ্রুত সেরে ওঠার জন্য ৬ সদস্যের চিকিৎসক বোর্ড আপনার পা-টিকে রেস্ট দিতে বলেছেন। আর আপনি সেকথা না মেনে, নিজের প্রতি অত্যাচার করে চলেছেন। হয়তো কিছুদিন পরে বলবেন, এই যে আপনি নানা জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছেন, সেটাও হয়তো বিজেপির চক্রান্ত। আর এই কারণে পা সেরে না ওঠার বিষয়টিকে সামনে এনে বলতেও পারেন, কোনো রকম অদৃশ্য কিছু প্রয়োগ করে আপনার পা-টিকে সেরে উঠতে দিচ্ছে না বিজেপি। কেননা, আপনি সব পারেন মাননীয়া!

(লেখক তরুণ সাংবাদিক)

ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী

নন্দীগ্রামে বিধান সভা ভোটের প্রচার চলাকালীন পায়ে চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা যখন তাঁদের গাড়ির দরজা অর্ধেক খুলে, কখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জনতার সঙ্গে জনসংযোগ করেন, কখনও-বা করমর্দন করেন, তখন ঝুঁকি একটা থেকেই যায়। অসাবধানতাবশত দুর্ঘটনার ঝুঁকি— কখনও পা পিছলে, কখনও-বা দরজা হঠাৎ কোনো কিছুর আঘাতে বন্ধ হয়ে গিয়ে। ঝুঁকি আমল দিয়ে উৎসাহী জনতার সঙ্গে অত্যুৎসাহী জনসংযোগ করার আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে, তার পরিণতির জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়। ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। বিধানসভা ভোটের ভরা মরসুমে মুখ্যমন্ত্রীর এই পায়ে চোট পাওয়ার ঘটনা দুঃখজনক। সেই জন্য সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে বিজেপি নেতারা তাঁকে দেখতে ও তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করতে হাসপাতালেও গেছিলেন। অন্যান্য দলের আরও অনেক রাজনৈতিক নেতা এই নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু অতি দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা হলো, একটি সাধারণ দুর্ঘটনাকে ষড়যন্ত্রের মোড়কে প্রতিস্থাপিত করে চক্রান্তের তত্ত্বকে সামনে এনে, সহানুভূতির হাওয়া লাগানো ও ভোটের বাজারে তার ফায়দা তোলার অপচেষ্টা করা। দশ বছর ক্ষমতায় থাকা একটি সরকার নির্বাচনের আগে বিগত দিনে তার কাজের নিরিখে মানুষের কাছে যায়।

কিন্তু তার পরিবর্তে যখন দশ বছর ক্ষমতায় থাকা একজন মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক কর্মসূচির পরিবর্তে সহানুভূতির জিগির তুলে ভোট বৈতরণী পার হতে তৎপর হন, তখন বুঝতে হবে সরকারের বিগত দিনের কাজ ও তার সাফল্য সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সন্দিহান। এই অপচেষ্টা শুধু অনৈতিকই নয়, অন্যায়ও বটে। অবশ্য তৃণমূল নেত্রী অনৈতিক ও অসাংবিধানিক কাজ থেকে কবেই-বা বিরত হয়েছেন!

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সচেতন, গণতন্ত্রপ্রিয় ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে বুঝতে হবে, ভারতবর্ষের মতো বহুদলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্বাচনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ যেমন জরুরি, সেরকম যোগ্যতম একটি রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় পাঠিয়ে তাঁর নিজের এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধন করাও কিন্তু সমানভাবে জরুরি। মনে রাখতে হবে, নির্বাচন হয় রাজনৈতিক দলগুলির নীতি, মতাদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করে; সেখানে একজন সচেতন নাগরিকের চুলচেরা বিশ্লেষণ জরুরি। কারণ একটি সরকার ক্ষমতায় আসে পাঁচ বছরের জন্য, ভুল সিদ্ধান্ত কিন্তু ভোগাতে পারে আরও পাঁচ বছর ধরে। দুর্নীতি, অপশাসন, বেকারত্ব, স্বৈরতন্ত্র-সহ যে অভিযোগে বর্তমান শাসকদল বিদ্ধ, মুখ্যমন্ত্রীর হুইল চেয়ারের প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করে ও আবেগ তাড়িত হয়ে, সেই দলকেই ভোটদান কিন্তু আগামী পাঁচ বছরের জন্য উপরোক্ত ঘটনাগুলিরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। মুখ্যমন্ত্রীর আঘাতপ্রাপ্ত পা একমাসে ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু একজন সাধারণ ভোটদাতার আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত তাঁকে আগামী ষাট মাসের জন্য যন্ত্রণা দেবে।

বিগত দশ বছর ধরে এই সরকার গণতন্ত্রের হত্যা ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য বহন করছে। বিরোধী কণ্ঠকে রোধ করার অপচেষ্টা, হত্যা ও রক্তপাতের রাজনীতিতে সিদ্ধহস্ত এই সরকার। বিজেপি করার অপরাধে ১৩৯ জন রাজনৈতিক কর্মীকে খুন হতে হয়েছে বিগত পাঁচ বছরে। একটি যুবতীর বৈধব্য যন্ত্রণা, একটি শিশুর পিতৃহারা হওয়ার যন্ত্রণা ও একটি বৃদ্ধার পুত্র শোকের যন্ত্রণা মুখ্যমন্ত্রীর ভগ্নপায়ের যন্ত্রণার থেকে অনেক বেশি। যার উপশম কোনো পার্থিব চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় হয় না। তাই আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত নয়, বাস্তবোচিত সিদ্ধান্ত এই সময়ে একান্ত কাম্য।

এই 'নেই রাজ্যে' না আছে শিল্প, না আছে বিকল্প কর্ম সংস্থানের সুযোগ। তাই কাজের খোঁজে অসংখ্য মানুষকে রাজ্য ছাড়তে হচ্ছে। সরকারি শূন্য পদ তুলে দিয়ে, চুক্তিভিত্তিক চাকরিকে প্রাধান্য দিয়ে সরকারি চাকরির সুযোগকে সংকুচিত করা হচ্ছে ও এই খাতের অর্থ অপব্যয় করা হচ্ছে। খুন, ধর্ষণ, রাহাজানিতে জর্জরিত রাজ্য এক অভূতপূর্ব আইনশৃঙ্খলার সংকটের মুখোমুখি। এই রাজ্য অপরাধীদের মরূদ্যানে পরিণত হয়েছে। একজন ধর্ষিতার মানসিক যন্ত্রণা, একটি যুবকের বেকারত্বের গ্লানি, মুখ্যমন্ত্রীর ভগ্নপায়ের যন্ত্রণার থেকে কোনো অংশে কম নয়। তাই বাস্তবোচিত সিদ্ধান্তের পরিচয় দেওয়া এই মুহূর্তে অধিক জরুরি।

(লেখক বিশিষ্ট অধ্যাপক)

মাওবাদীরা এখন মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক মুখ হয়ে উঠেছে

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদী শক্তির রাজনৈতিক উত্থানে বেজায় চিন্তায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএমের পাশাপাশি কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ নেতৃত্বও। তবে আরএসএস বিরোধিতায় অবশ্যই সকলকে টেক্কা দিতে চায় চারু মজুমদারপন্থী সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-সহ নকশাল গোষ্ঠীগুলি। বিজেপি, আরএসএস, এবিভিপিকে প্রতিহত করার ডাক দিয়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে নকশাল গোষ্ঠীগুলি-সহ এসইউসি-র মতো অতি বামদলগুলি। কলকাতা, শিলিগুড়ি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার ডাক দিয়ে পোস্টার দিয়েছে অতিবামেরা। একই সঙ্গে কৃষক আন্দোলনে যোগদানকারী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গে এসে বিজেপি বিরোধিতায় উপযুক্ত বিজেপি বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার ডাক দিতে চলেছেন। এই সংগঠনগুলির মধ্যে রয়েছে সিপিএম, সিপিআই, লিবারেশনের কৃষক সংগঠনও। যার অন্যতম নেতা প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ ও কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক হান্নান মোল্লা। এরা লিবারেশনের লাইন মতো তৃণমূলকে ছেড়ে বিজেপিকেই রাজনৈতিক ভাবে টার্গেট করতে চাইছেন। তাঁদের হাব ভাবে সেই গোপন অ্যাজেন্ডাই প্রকাশিত হতে চলেছে। হিন্দুত্ব, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ, ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তুলে এবার অতি বামপন্থী শিবির বিজেপি-আরএসএস-কে নিশানা করেছে। শুধু বিজেপিকে নিশানাই নয়, তারা মমতার পক্ষে দাঁড়িয়ে আরজেডি নেতা তেজস্বী প্রসাদ যাদবকে প্রভাবিত করে কলকাতায় এনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করাতে অনুঘটকের কাজ করেছে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

এসইউসি, সিপিআই (এমএল)-লিবারেশন, অন্য একাধিক নকশালপন্থী গোষ্ঠী বিজেপি- আর এস এস-কে নিশানা করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া জেলায় সীমিত শক্তিতেও অতি বামপন্থীরা বিজেপি- আরএসএস বিরোধী প্রচার শুরু করেছে। এতে সিপিএম তো বটেই, কংগ্রেস এমনকী তৃণমূল কংগ্রেসেও স্বস্তিতে। মাওবাদীরাও মমতামুখী। এক সময় পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গল মহলে মাওবাদীদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। তারা সিপিএমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিয়ে এক সময়ে তৃণমূলের সহযোগী শক্তি হয়ে ওঠে। মাওবাদী নেতা কিষানজীর অনুপ্রেরণায় জঙ্গলমহলেই সিপিএমকে নিশ্চিহ্ন করতে গুপ্ত হত্যার পথ নেয় মাওবাদীরা। এই মাওবাদীদেরই সহযোগী শক্তি হয়ে ওঠেন পুলিশ সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতো। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে, ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে মাওবাদী, অতি বামপন্থীরা কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস সে কথাই বলে।

২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সমর্থন ও মদতে এসইউসি জয়নগর আসনে বিজয়ী হয়। সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-সহ একাধিক অতি বামপন্থী শক্তি তৃণমূলের সহযোগী শক্তি হিসেবেই কাজ করে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির উত্থান ও ১৮টি লোকসভা আসন জয়, ১২১টি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে যাওয়া ও ৬১টি বিধানসভা কেন্দ্রে মাত্র ১ হাজার থেকে ৩ হাজার ভোটে হারার পর উজ্জীবিত বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, কংগ্রেস একযোগেই পশ্চিমবঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা ও হিন্দু সাম্প্রদায়িক বিজেপি-আরএসএস বিরোধী লড়াই চালাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে কারণেই এসইউসি, লিবারেশন-সহ অতি বামেরাও বিজেপি- আরএসএস বিরোধিতাকে সামনের সারিতে নিয়ে আসতে চাইছেন। বিজেপির উত্থানের ক্ষেত্র উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল ও বাংলাদেশ সীমান্ত জেলাগুলিতে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রচারে সক্রিয় বাম, অতি বামেরা। মাওবাদীদের যে অংশ তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অবস্থান করছেন ও ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে মাওবাদী ঘনিষ্ঠরাও এখন বিজেপি-আরএসএসের বিরোধিতার পাশাপাশি 'হিন্দু ফ্যাসিবাদ' বিরোধী আদর্শগত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে চাইছেন। ছত্রধর নিজে এখন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও ঝাড়গ্রাম জেলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক মুখ হয়ে উঠেছেন। তবে ৭০ দশকের হিংসা, খুন, গুপ্তহত্যা ও শ্রেণীশত্রু খতমের রাজনীতির আদর্শে বিশ্বাসী নকশালপন্থীরা কতটা বিজেপি- আরএসএসের বিরুদ্ধে সফল ভূমিকা নিতে পারবেন তা নিয়ে সন্দেহ থাকছেই। অতি বামেরা পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের সঙ্গে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মতো কোনও গোপন রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় যাচ্ছে বলেই সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে রাজনৈতিক মহলে।

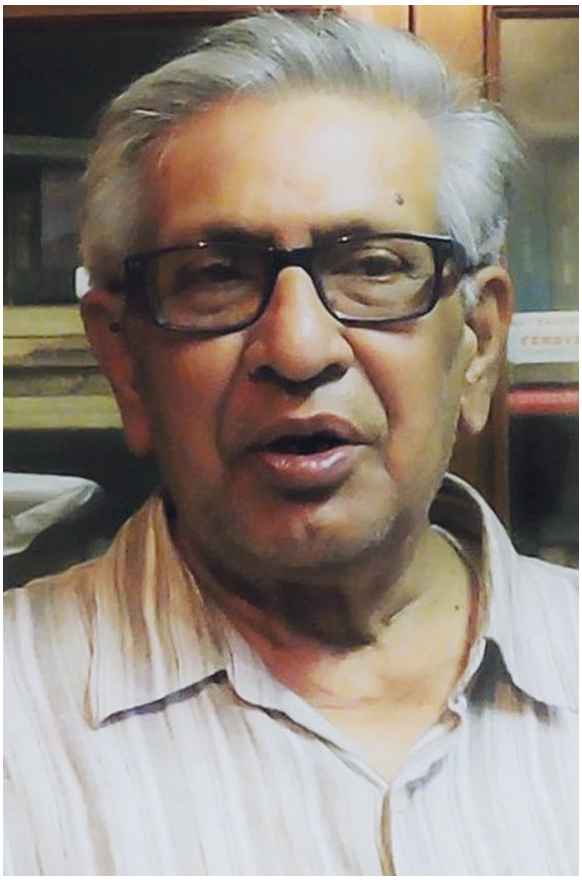

সাহিত্যিক রমানাথ রায়ের জীবনাবসান

বিজয় আঢ্য ॥ হঠাৎই, একেবারে হঠাৎই, কোনও রকম কাউকে নোটিশ না দিয়ে রমানাথদা— রমানাথ রায় ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আগের দিন রাতেও ছেলে-বউমার সঙ্গে গল্প করেছেন। কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের আক্রমণে সব শেষ। ৮১ বছরে জীবনের আকস্মিক অবসান। জন্ম মধ্য কলকাতায় ১৯৪০ সালের ৩ জানুয়ারি। পৈতৃক বাড়ি যশোহরে হলেও তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই মধ্য কলকতাতেই। ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষকতা করতেন।

পাশাপাশি চলছিল সাহিত্য চর্চা। মূলত তিনি গল্পকার। আশেপাশে যা তিনি দেখেছেন, আপন অনুভবের রঙে রাঙিয়ে তাকেই গল্পে রূপ দিয়েছেন। প্রেম-প্রণয়, হিংসা-দ্বেষ, দ্বিচারিতা, অবচেতন মনের নানা ক্রিয়াকলাপ তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। রচনাশৈলীতে শিথিলতা নেই, ছোটো ছোটো বাক্যবন্ধনে তা গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলে গল্পকে পূর্ণত দিয়েছে। বর্তমানে যে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে, তা তাঁকে পীড়া দিয়েছে। অন্তরের সেই চাপা বেদনার কথাই তিনি গল্পের নায়ক-নায়িকাদের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখক সত্তার মূলে ছিল সত্যের অধিষ্ঠান। তিনি লিখেছেন— 'কাপুরুষরা কখনও ভালো লেখক হতে পারে না।' সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলতে তিনি কখনও ভয় পাননি। তাঁর কয়েকটি গল্প যেমন, 'গিলিগিলি রমানাথ', 'দু' ঘণ্টার ভালোবাসা, 'অমুকচন্দ্র অমুক' উল্লেখযোগ্য। রমানাথ রায় ষাটের দশকের শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা। যা চিরাচরিত স্টাইল থেকে আলাদা। বাংলা গল্প-উপন্যাসের আঙ্গিক ও কথনশৈলীতে বস্তুবাদ যখন চেপে বসেছে ঠিক তখনই রমানাথবাবু এনেছিলেন অন্যরকম স্বাদ। বস্তুবাদ আর কল্পজগৎ মিলেমিশে গিয়েছিল তার লেখায়। সঙ্গে ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ডার্ক হিউমার। বাঙ্গালি পাঠক তাঁর মধ্যে আবিষ্কার করেছিল এক ছকভাঙা কথককে। ২০১৪ সালে রমানাথ রায় বঙ্কিম পুরস্কার পান। ছোটোগল্পের তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় লেখক। 'ছবির সঙ্গে দেখা', 'ভালোবাসা চাই', 'কাঁকন' ইত্যাদি তাঁর কিছু সুলিখিত উপন্যাস। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হিন্দি, ইংরাজি, মারাঠি ও কানাড়ি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

স্বস্তিকা-তে তাঁর লেখালিখি শুরু গত শতকের নয়ের দশকে— পূজা সংখ্যায় গল্প দিয়ে। এরপর কোনও থামাথামি নেই। একটানে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে তাঁর লেখনি স্বস্তিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। আসলে স্বর্গীয় ভবেন্দু ভট্টাচার্যের ও স্বস্তিকা পরিবারের সান্নিধ্যে তিনি কখন যে স্বস্তিকা পরিবারের একজন হয়ে গেছেন! তিনি গল্প করতে ভালোবাসতেন। চা আর মুড়ির সঙ্গে তা আরও জমে যেত। সাহিত্য- সংস্কৃতি থেকে রাজনীতি— কোনও কিছুই বাদ যেত না। স্বস্তিকায় তাঁর শেষ উপস্থিতি গত ২ জনুয়ারি। লকডাউনের প্রায় ৯ মাস বন্ধ থাকার পর স্বস্তিকার ৪ জানুয়ারি সংখ্যাটি ঘরোয়াভাবে উন্মোচনের এক অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেটাই ছিল আমাদের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা। শেষ দেখা হলেও শেষ কথা নয়। এরই মধ্যে অনেকবারই তিনি ফোন করেছেন। শরীর-স্বাস্থ্য থেকে বর্তমান রাজনীতি কোন পথে— সবই থাকত সেই কথোপকথনে।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের জন্য তিনি খুব উদ্বেগ বোধ করতেন। দেশভাগের বলি মূলত এই বাঙ্গালি হিন্দু সমাজকেই হতে হয়েছিল। তাই হিন্দু জাতীয় চেতনা জাগরণের জন্য হিন্দু সমাজকে সংগঠিত হওয়ার জন্য তিনি সরব ছিলেন। সভা-সমিতিতে তিনি তাঁর উদ্বেগের কথা সোচ্চারে জানাতেন।

এরকম এক সদালাপী সহৃদয় মানুষটির আকস্মিক প্রয়াণে স্বস্তিকা পরিবার এক অত্যন্ত আপনজনকে হারাল। তিনি রেখে গেছেন এক পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা-জামাতা-সহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুজনকে। শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি। ▯

বাঙ্গালি হিন্দু গণহত্যা এবং আমাদের ইতিহাসবিমুখতা

স্বর্ণাভ মিত্র

সাতাশে মার্চ বাঙ্গালি হিন্দু গণহত্যা স্মরণ দিবস। এই উপলক্ষ্যে মনে পড়ে আরেক সাতাশের কথা। ১৯৬৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ থেকে নবি হজরত মহম্মদের সংরক্ষিত চুল উধাও হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুনে জ্বলে উঠেছিল। তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুস সাবুর খান ও আব্দুল হাই নামের অপর একজন বাংলাভাষী মুসলমান নেতার নেতৃত্বে খুলনায় ১৯৬৪ সালে ৪ জানুয়ারি হিন্দু গণহত্যা সংঘটিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ কোম্পানি ইস্পাহানি মুসলমান আক্রমণকারীদের আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করেছিল। শুধু মংলা বন্দরেই ওইদিন প্রায় ৩০০ হিন্দু নিহত ও আহত হয়েছিল। আক্রমণ রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রাজধানী ঢাকাতেও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। যদিও বাংলাদেশের হতভাগ্য হিন্দুদের সঙ্গে হজরতবালের ঘটনার কী সম্পর্ক থাকতে পারে তা দূরতম কল্পনাতেও 'সুস্থ মস্তিষ্কে' বোঝা অসাধ্য।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের উত্তরপ্রদেশে বাবরি ধাঁচা ধুলিসাৎ হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ে হিন্দুদের উপর ইমানি জনতার আক্রমণ শুরু হয়। খোদ ঢাকা শহরে ঢাকেশ্বরী মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন, সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির-সহ হিন্দুদের বহু প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা ক্ষেত্র ধ্বংস করা হয়। মানিকগঞ্জ থেকে ময়মনসিংহ, নরসিংহদি থেকে নারায়ণগঞ্জ সর্বত্র ইসলামিক মৌলবাদী হিংসার বলি হন হিন্দুরা। এবারেও উত্তরপ্রদেশের ঘটনার জন্য বাংলাদেশের হিন্দুরা কীভাবে দায়ী তা দুর্বোধ্য থাকে।

নিজের ত্রুটিপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক লেন্স দিয়ে অন্যের চিন্তাভাবনা পড়ার নির্বুদ্ধিতা এবং ইতিহাসবিমুখতা বাঙ্গালির দুটি প্রধানতম রোগ। তাই তথাকথিত অস্বস্তিকর অর্থাৎ জরুরি প্রশ্নগুলির সামনে মুখ লুকিয়ে পিঠটান দেওয়া কিংবা গলা তুলে প্রশ্নকর্তাকে 'সাম্প্রদায়িক' তকমা দেওয়ায় বাঙ্গালির জুড়ি মেলা ভার।

ভারতীয় বিপ্লবী চিন্তাধারার জনক বিপিনচন্দ্র পাল ১৯১২ সালে 'বিজয়া' পত্রিকায় 'রাষ্ট্রনীতি' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'ভারতীয় মুসলমানেরা আগে মুসলমান পরে ভারতীয়। সৈয়দ আমির আলির মতো মুসলমান নেতারা বলেন, 'যদি ইসলামিক দেশ থেকে আক্রমণকারীরা আসে তবে ভারতের মুসলমানদের দায়িত্ব হলো ভারতের বিরুদ্ধে সেইসব আক্রমণকারীকে সাহায্য করা। কারণ মুসলমান আইডেন্টিটি তাঁদের কাছে অধিক জরুরি।' তাঁর আশঙ্কা যে একেবারেই অমূলক ছিল না তা কয়েক বছরের মধ্যেই খিলাফত আন্দোলনের সময় পরিষ্কার হয়ে যায়। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের খলিফাকে আন্দোলনের প্রধানতম হোতা শওকত আলি ও মুহাম্মদ আলি বলেছিলেন, 'ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ ভারতীয় হিন্দুদের সঙ্গে এক নয় বরং তা ত্রিপোলি, আলজেরিয়া বা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের মুসলমানের সঙ্গে এক।' ১৯২৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ন্যাশনালিটি অ্যান্ড এম্পায়ার্স' বইয়ের 'ন্যাশনালিজম অ্যান্ড পলিটিক্স' প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র তাই লিখেছিলেন 'ভারতের কাছে ভবিষ্যতে ব্রিটেন বা ইউরোপ নয়, আসল বিপদ হয়ে উঠবে প্যান-ইসলামিজম।'

দেখা যাচ্ছে উপরোল্লিখিত

বাংলাদেশের দুটি ঘটনায় যে প্রশ্নের উত্তর পাঠক হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন তা বিপিনচন্দ্র পালের মতো প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব কয়েক দশক আগেই দিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙ্গালি নয় বরং তারা বৃহত্তর ইসলামিস্ট জাতিসত্তার অংশ। তাই বহু দূরে ভিনদেশের হজরতবাল বা বাবরির ঘটনায় তারা সংখ্যালঘু হিন্দু কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের রসদ খুঁজে পায়। পূর্ববঙ্গে এই জিহাদের শিকড় ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে মুসলিম লিগের ছাপানো কুখ্যাত 'লাল ইস্তাহার' নামক প্রচারপত্রে হিন্দু নিধন, নিপীড়নে উস্কানি দেওয়ার মধ্যে নিহিত ছিল বলে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলাদেশের ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড' থেকে জানা যায়। গবেষক অরুণ মুখার্জি তাঁর 'ক্রাইম অ্যান্ড পাবলিক ডিজর্ডার ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল' নামক বইতে ১৯০৫ থেকে ১৯১২ অবধি প্রায় ২০০টি হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা নথিবদ্ধ করেছেন।

অবশ্য ১৮৩০ সালে তিতুমিরের ওয়াহাবি আন্দোলনের সময় থেকেই বাংলাভাষী মুসলমানরা মৌলবাদী চিন্তাধারায় পুষ্ট হতে থাকে। জয়ন্তী মৈত্রের 'মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল (১৮৫৫-১৯০৬)' বই থেকে জানা যায়, ঢাকার নবাব আব্দুল লতিফ মুসলমান ছাত্রদের ব্রাহ্ম সমাজ, বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি হতে বারণ করেছিলেন, কারণ তাতে 'হিন্দু প্রভাব ছিল'! জাস্টিস সৈয়দ আমির আলি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে যোগদন করতে অসম্মতি জানান, কারণ তা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল! এইভাবেই বাংলাভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠী দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ সৈয়দ আহমদ খানের অনেক আগেই বপন করে ফেলেছিল।

অন্যদিকে বাঙ্গালিদের মধ্যে গণহত্যা বিষয়ক চর্চা কখনোই মূলধারায় জায়গা পায়নি। এরকম নিদর্শন গোটা দুনিয়ায় বিরল। ইহুদিরা নাৎসি জমানার ভয়াবহ অত্যাচারের স্মৃতি জিইয়ে রাখতে হলকাস্ট মিউজিয়াম তৈরি করেছে। আফ্রিকার রোয়ান্দায় হুটু উপজাতির হাতে তুতসি জনগোষ্ঠীর ভয়াবহ গণহত্যা স্মরণ করে নিহতদের মাথার খুলি দিয়ে জেনোসাইড মেমোরিয়াল বানানো হয়েছে। অথচ বাঙ্গালিরা তাদের গণহত্যার কথা ভুলে যেতে চেয়েছে। নানাপ্রকার অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করে উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে থেকেছে। যেমন স্বাধীনতার আগে বাঙ্গালি ভেবেছে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গাগুলো বোধহয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করতে ব্রিটিশরা করাচ্ছে তাই ব্রিটিশদের বিদেয় করতে পারলেই সমস্যার সমাধান হবে। কারণ বাঙ্গালি বিপিনচন্দ্রকে মনে রাখেনি। তাই ১৯৪৬ সালের কলকাতা ও নোয়াখালি গণহত্যা থেকে বাঁচতে পারেনি। বাঙ্গালি ভেবেছে দেশভাগের কোনো চুক্তিতে ধর্মীয় জনবিনিময়ের কথা লেখা ছিল না তাই দেশভাগের কারণে উদ্বাস্তু হওয়ারও প্রশ্ন আসে না। তাই বাঙ্গালি ১৯৫০, ১৯৬৪, ১৯৯২-এর গণহত্যা থেকে, তথাকথিত 'বাঙ্গালির রাষ্ট্রে' জমি-সম্পদ লুঠ হওয়ার থেকে, গণধর্ষিতা হওয়ার থেকে রেহাই পায়নি। লাল ইস্তাহারের ঝাপটা ভুলতে বাঙ্গালির ৫০ বছরও লাগেনি।

১৯৭১-এর গণহত্যাগুলিকে বাঙ্গালিরা পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ও তাঁদের সহযোগী বিহারি খানসেনার কার্যকলাপ বলতে পছন্দ করে এবং এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালির সবিশেষ নজর থাকে যেন কোনওভাবেই এগুলির দায় পূর্ববঙ্গের বাংলাভাষী মুসলমানের উপর না চাপে। কিন্তু সত্যিটা হলো, শান্তি কমিটি ও স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতা না থাকলে কখনই পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক হারে ২২ লাখ হিন্দুকে হত্যা করতে পারত না। মহিলাদের গোপনাঙ্গে মানকচু, কইমাছ ঢুকিয়ে অত্যাচার করতে পারত না, কারণ পাকিস্তানের মানুষ এই বস্তুগুলির সঙ্গে পরিচিত নয়! এই রাজাকার পন্থীরা স্বাধীন বাংলাদেশে একাধিকবার জনতার সমর্থনে ক্ষমতা দখল করেছে, যথেচ্ছ হিন্দু নির্যাতন করেছে। সবথেকে বড়ো কথা, খোদ শেখ মুজিব ক্ষমতা গ্রহণ করে 'ল অব কন্টিনিউইয়েন্স এনফোর্সমেন্ট অর্ডার ১৯৭১' প্রণয়নের মাধ্যমে সমস্ত পাকিস্তানি আইন কানুন বলবত রাখেন। তাই এই প্রবন্ধে ১৯৭১ সালের পূর্ববর্তী ঘটনা উল্লেখের সময় সচেতন ভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের বদলে বাংলাদেশ, পূর্ববঙ্গ শব্দগুলি ব্যবহার করা হলো। তারপরেও বাঙ্গালিকে 'একবৃন্তে দুটি কুসুম' আওড়ানো থেকে আটকানো যায়নি। কারণ বাঙ্গালির প্রধান সমস্যা সে নিজে দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাই সে ভাবে তার প্রতিবেশী আরবি নামধারীটিও তারই মতো ধর্মহীন! বাঙ্গালি 'যাহা রাম তাহাই রহিম' ভেবে ভাবের ঘরে চুরি করতে ভালোবাসে। আম বাঙ্গালি এক লাইনও কোনো ধর্মগ্রন্থ পড়ে না কিন্তু সে ধরে নিয়েছে 'সব ধর্মই ভালোবাসা ও শান্তির কথা বলে। বাঙ্গালি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে 'পেটে লাথি পড়লে ধর্ম পেছন দিয়ে পালায়' অথচ পেছনে ধর্মের লাথি পড়ায় খালি পেটে বাঙ্গালিকে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। একবাক্যে, নিজের ত্রুটিপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক লেন্স দিয়ে অন্যের চিন্তাভাবনা পড়ার নির্বুদ্ধিতা এবং ইতিহাসবিমুখতা বাঙ্গালির দুটি প্রধানতম রোগ। তাই তথাকথিত অস্বস্তিকর অর্থাৎ জরুরি প্রশ্নগুলির সামনে মুখ লুকিয়ে পিঠটান দেওয়া কিংবা গলা তুলে প্রশ্নকর্তাকে 'সাম্প্রদায়িক' তকমা দেওয়ায় বাঙ্গালির জুড়ি মেলা ভার। ▯

With Best Compliments from -

A Well Wisher

বঙ্গ ভাগের ইতিবৃত্ত

শালিবাহন ভট্টাচার্য

প্রাচীন যুগ

বৈদিক সাহিত্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'বঙ্গ' শব্দটি সর্বপ্রথম 'একটি জাতি ও দেশের' নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল (বঙ্গামগাধাশ্চেরপদা)। মহাভারতের সভা পর্বের ঊনত্রিশ অধ্যায়ে ভৌগোলিক বঙ্গ চারটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। পূর্বে ছিল বঙ্গ, উত্তরে পুন্ড্র, পশ্চিমে সুহ্ম এবং দক্ষিণে তাম্রলিপ্ত। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার একশো আটান্ন বছর (সূর্যসিদ্ধান্ত) আগে সংঘটিত মহাভারতের যুদ্ধে এখানকার রাজারা অংশ নিয়েছেন।

বৌধায়ন সূত্র, শতপথ ব্রাহ্মণ, অভিধান চিন্তামণি এবং মঞ্জুশ্রীমূলকল্প ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে 'বঙ্গ' এবং এখানে বসবাসরত বিভিন্ন গোষ্ঠীর উল্লেখ রয়েছে। মগধ সাম্রাজ্য, মৌর্য যুগ এবং তার পরেও এই ভৌগোলিক অঞ্চল যে খুব সমৃদ্ধ ছিল ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ আছে। গ্রিক ঐতিহাসিকরা যে 'গঙ্গাহৃদি' বা নিম্ন গাঙ্গেয় ও সন্নিহিত অঞ্চলের কথা লিখেছিলেন তা ছিল এখনকার বিস্তীর্ণ বাঙ্গলা। তাম্রলিপ্ত ছিল এক সুপ্রসিদ্ধ সমুদ্র বন্দর। প্রাণাধিক পুত্রকে তাম্রপর্ণীর উদ্দেশ সমুদ্র তরণীতে তুলে দেওয়ার পর এক কর্তব্যনিষ্ঠ পিতার মূর্ছিত হওয়ার কাহিনি আজও অতি বড়ো পাষাণকেও বিদীর্ণ করে। না, পুত্র মহেন্দ্রর সঙ্গে তার পিতার আর কখনো দেখা হয়নি। সম্রাট অশোক তাম্রলিপ্ত বন্দরেই পুত্রকে বিদায় জানিয়েছিলেন। 'অশোকাবদান' বইতে এই মর্মস্পর্শী বিবরণ লেখা আছে।

'ভবিষ্য পুরাণে' এই ভৌগোলিক অঞ্চলের সাতটি খণ্ড রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। এগুলি হলো— (১) গৌড়, (২) বরেন্দ্র, (৩) সুহ্ম বা রাঢ়, (৪) নীবিতি (এখনকার বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশ), (৫) ঝারিখণ্ড (অবিভক্ত সাঁওতাল পরগনা), (৬) বরাহভূমি (অবিভক্ত মানভূম) এবং (৭) বর্ধমান। এ থেকেই বোঝা যায় যে গাঙ্গেয় অববাহিকার দক্ষিণাংশের জলনির্গম প্রণালী অঞ্চলের প্রায় সবই প্রাচীন বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল।

মধ্য যুগ

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি বাঙ্গলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করলে এক বিভীষিকাময় যুগের সূচনা হয়েছিল। ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে সেন বংশের শেষ রাজা মধু-সেনের মৃত্যুর পর বাঙ্গলায় অন্ধকার নেমে আসে। হিন্দু দেবস্থান অপবিত্র করা, মন্দির ধ্বংস করা আর জোর করে, ভয় দেখিয়ে বা কখনো লোভ দেখিয়ে ধর্ম পরিবর্তন করা হয়ে উঠল নিত্য দিনের ঘটনা। এর সঙ্গে যুক্ত হলো 'জাত মারা' এবং 'জাত যাওয়া'। বাঙ্গলায় বাড়তে থাকলো মুসলমান জনসংখ্যা। ক্রমেই হিন্দুদের সঙ্গে তাদের বিভেদ বাড়তে থাকলো। ইলিয়াস শাহী বা হুসেন শাহী আমলে এর বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। অল্প কিছু দিন রাজা গণেশ রাজত্ব করলেও পরিস্থিতি একই ছিল।

ব্রিটিশ যুগ

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট বাদশাহি ফরমান অনুযায়ী সুবা বাঙ্গলার দায়িত্ব ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে আসে। ব্রিটিশ আমলে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার সুবা বাঙ্গলা ভাগ হয়। বাংলাভাষা প্রধান গোয়ালপড়া, কাছাড় ও শ্রীহট্ট অসমের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো আঘাত এল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর। একটি মুসলমান প্রধান রাজ্য গড়ে পূর্ববঙ্গকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার জন্য জেহাদের ডাক দেওয়া হলো।' জামালপুর ও কুমিল্লায় হিন্দুদের উপর ভয়ানক অত্যাচার হয়েছিল। নেতৃত্বে ছিলেন নবাব সালিমুল্লাহ। এবারের ভাঙনে হিন্দু বাঙ্গালিরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। বাঙ্গলায় রইলো বিহার, ওড়িশা, প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ। জনসংখ্যা হলো ৫ কোটি ৪০ লক্ষ, যার মধ্যে হিন্দু ছিল ৪ কোটির কিছু বেশি। অন্যদিকে অসম ও পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১০, যার মধ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বিহার, ওড়িশা ও অসম পৃথক হলো। বাঙ্গলায় হিন্দুরা বরাবরের জন্য সংখ্যালঘু হয়ে গেল। তখনও কেউ বুঝতে পারেনি যে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ধ্বংস করে হিন্দু বাংলাভাষীদের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা বাকি আছে। ১৯৪৭-এর ১৪-১৫ আগস্ট ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলাও ভাগ হয়ে গেল। হিন্দুদের রক্তে লাল হতে লাগলো র‍্যাডক্লিফ লাইনের পূর্বদিক। এখনো যার বিরাম নেই। পশ্চিমবঙ্গ পেল ৩৬ শতাংশ জমি ও ৩৫ শতাংশ মানুষ। এর মধ্যে হিন্দু ৮০ শতাংশ আর মুসলমান ও অন্যান্য ২০ শতাংশ। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) পেল ৬৪ শতাংশ জমি ও ৬৫ শতাংশ মানুষ। মুসলমান জনসংখ্যা হলো ৭০ শতাংশ এবং হিন্দু ২৮ শতাংশ ও ২ শতাংশ বৌদ্ধ।

শুরু হলো বিতাড়নের অধ্যায়। বাংলাদেশে এখন ৯২ শতাংশ মুসলমান আর মাত্র ৮ শতাংশ হিন্দু-বৌদ্ধ ইত্যাদি রয়েছেন। বলাই বাহুল্য যে প্রায় ২২ শতাংশ (১৯৪৭-এর ভিত্তিতে) মানুষ পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ও বাকি ভারতে শরণ নিয়েছে। প্যান-ইসলামিক আগ্রাসন কিন্তু থেমে নেই। এখনকার পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের সংখ্যা কমে হয়েছে ৬৬-৬৮ শতাংশ। অথচ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩২-৩৪ শতাংশ। নানা কারণে এই বৃদ্ধি অব্যাহত। এর মধ্যে অনুপ্রবেশ অবশ্যই একটি বড়ো কারণ।

শব্দরূপ-১১ (বিষয় অভিমুখ : বিবিধ) **অরুণ কুমার ঘোড়ই**

১	২	■	৩		৪	■	■
৫				■	৬		৭
৮		■	৯			■	
■	১০	১১		■	১২	১৩	
১৪			■	১৫			■
	■	১৬			■	১৭	১৮
১৯			■	২০			
■	■	২১			■	২২	

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. দীপ্তি, কিরণ, ঔজ্জ্বল্য-এ।
৩. রাজা, অধিপতি—এমনই বলে। ৫. তির ছোঁড়াতে দক্ষ যে।
৬. এ নাচ-গান হয় গুজরাটে। ৮. 'জানা হয়ে গেছে'—এবার বল।
৯. আজমীরের কাছে হ্রদ ও তীর্থ—চল।
১০. 'হস্তিচালক'—চিনলে তবে।
১২. পারের কড়ি— পেতেই হবে।
১৪. চাঁদোয়া, পট, মণ্ডপ—সবই।
১৫. 'লেখনী' ধর—উত্তর পাবি।
১৬. দ্রৌপদীর তো বাপের দেশ-এ।
১৭. 'ব্যর্থ'ই পাবি, খুঁজলে শেষে।
১৯. বীর শিবাজীর জাতি-আহা!
২০. তাপকে হরণ করে যাহা।
২১. পদ্ম ফোটে সরোবরে।
২২. বালক কৃষ্ণ চুরি করে।

উপর-নীচ : ১. সংকল্প বা দৃঢ় পণ।
২. আমার দেশটি মায়ের মতন।
৩. রাজস্থানের ক্ষত্রিয় জাত।
৪. নগর রক্ষা তো এরই কাজ।
৭. কাব্যে 'বাছা, বৎস' এটি!
১১. হানাদার দুই প্রাচীন জাতি।
১৩. সতীদাহ রোধে ইনি স্মরণীয়।
১৪. 'বল, পরাক্রম' শব্দে আনিও।
১৫. সমবেত মধুর ধ্বনি।
১৮. তিনটি ঘরে আছে গৃহিণী।

(● আগামী সংখ্যায় সঠিক উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হবে।)

প্রেরণার পাথেয়

আমরা কেবল ব্যক্তিগত চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত থাকি। আমরা আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির কথা মনেও রাখি না। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির পরিবর্তন হইলে আমাদিগকে সংগঠিত হইতেই হইবে।

* * *

ইংরাজিতে প্রবাদ আছে যে *God helps those who help themselves*। ইহার অর্থ এই যে 'ভগবান তাহাকেই সাহায্য করেন যে নিজেকে নিজেই সাহায্য করে'। আমি ইহা বুঝিতেই পারি না যে ভগবান কেন আমাদিগকে সহায়তা করিবেন? আমরা নিজেদের রক্ষার্থে নিজেরা কী করিয়াছি যে ভগবান আমাদের রক্ষা করিবেন? তিনি বলিয়াছেন যে 'পরিত্রাণায় সাধূনাং'। তিনি অবতার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু কে সাধু? সাধু কাহাকে বলে? নিজের সমাজ বা রাষ্ট্র, ধর্ম বা সংস্কৃতি কোনো কিছু সম্বন্ধেই যাহার চিন্তা নাই, ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা ব্যতীত যাহার আর অন্য কোনো কিছু পছন্দ হয় না, সেইরূপ দুষ্টের সংহার করিবার জন্যই ঈশ্বর অবতাররূপ গ্রহণ করেন। হিন্দু সমাজে এই সব দোষগুলি শেষ সীমানায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। এই সব লোককে কি দুষ্ট বলা উচিত নয়? সাধু তিনি, যিনি ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের কথা মনে করিয়া সব সময় নিজের কর্তব্য করিতে প্রস্তুত থাকেন। এই প্রকার ত্যাগী ও কর্তব্যপরায়ণ লোক কি ভারতে যথেষ্ট সংখ্যায় আছে? অন্ততঃপক্ষে হিন্দুসমাজের অর্ধেক লোকের মধ্যেও যদি উপরোক্ত সাধুতা থাকিত তাহা হইলে এই মহান জাতির উপর আঘাত করিবার দুঃসাহস কাহারও হইত না এবং ধর্মের সংরক্ষণ করিবার জন্য ভগবান নিজেও আমদের মধ্যে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু আজিকার এই জাতির মধ্যে স্বার্থপর ও দুর্বল অর্থাৎ পাপীদের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া ভগবানও আমাদের প্রতি বিমুখ। যদি ভগবান কখনও অবতাররূপ গ্রহণ করেন তবে আমাদের রক্ষার জন্য নহে—বিনাশ করিবার জন্যই করিবেন। কারণ দুষ্টের বিনাশ করাই তাঁহার লক্ষ্য। যতদিন আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ, দুর্বলতা ও সমাজের ভালোমন্দের প্রতি উদাসীনতা থাকিবে এবং যতদিন না আমরা সাধুর ন্যায় আচরণ করিব ততদিন আমাদিগকে দুষ্ট মনে করিয়া ভগবান আমাদিগকে নাশ করিবার চেষ্টাই করিবেন। কিন্তু যদি আমরা সাধুর ন্যায় ব্যবহার করি এবং ধর্ম ও সমাজের জন্য নিজেদের সব কিছু উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হই তবেই ভগবান আমাদের সহায়তা করিতে পারেন।

* * *

আপনারা স্বার্থ ও অকর্মণ্যতার চিন্তা ত্যাগ করুন। সমাজে সেবামূলক কাজের প্রতি উদাসীনতার ফলেই আমাদের মন এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে! 'সমাজ চুলোয় যাক, আমার তাতে কোনো ক্ষতি নেই, নিজের স্বার্থসিদ্ধি হলেই হলো'—এই প্রকার মনোভাব আমাদের মধ্যে ওতঃপ্রোত ভাবে রহিয়াছে। এই জন্যই আমাদের সমাজ আজ এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মানসিক দুর্বলতার ফলভোগ করিতে হইতেছে সমাজকে। মনের দুর্বলতাই সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা। যদি আমরা নিজেদের শক্তিশালী মনে করিয়া সংগঠনের কাজে উৎসাহের সহিত লাগিয়া যাই তবে আমাদের শক্তি বিরাটরূপ ধারণ করিবে। তখন কোনো কিছুই আর অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না।

('ডাক্তারজীর বাণী' পুস্তিকা থেকে গৃহীত)